وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

‘আর তোমরা হীনমন্য হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে- যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। তোমরা যদি হতাহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি হতাহত হয়েছে। এ দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এর মাধ্যমে আল্লাহ দেখতে চান কারা ঈমানদার, আর তোমাদের কিছু লোককে তিনি শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না’

(আলে ইমরান, ৩/১৩৯-১৪০)।

● ৫ম বর্ষ ● ৯ম সংখ্যা ● জুলাই ২০২১

Web : www.al-itisam.com

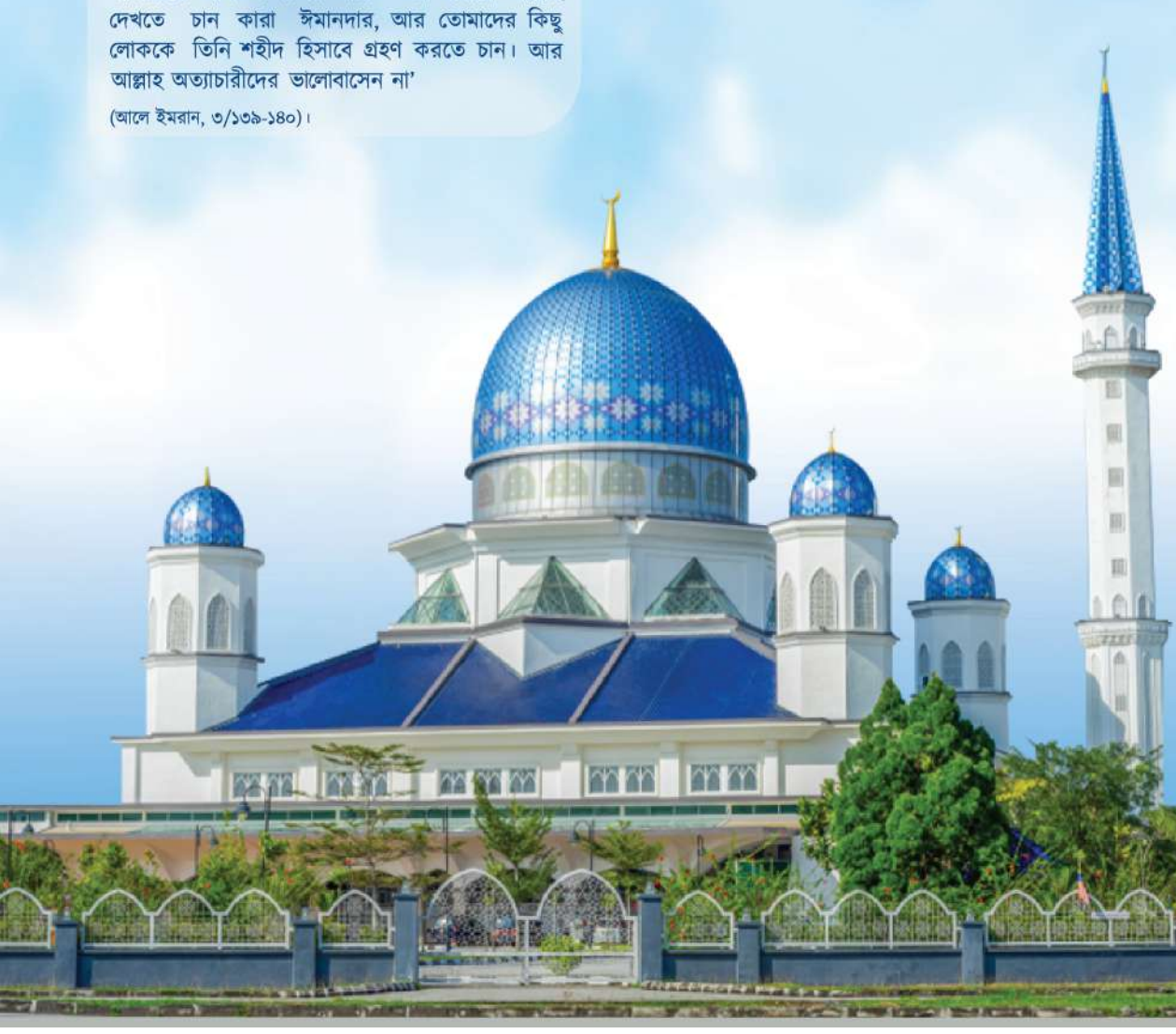

সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة: ٥، ذو القعدة و ذو الحجة ١٤٤٢ هـ/ يوليو ٢٠٢١م العدد: ٩، الجزء: ٥٧

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM

Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**

Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;

Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

আব্দুল্লাহ ফাহিম মসজিদ, মালয়েশিয়া : সমুদ্রতীর হতে মাত্র ১০ কি.মি. দূরে অবস্থিত মালয়েশিয়ার কেপালা বাতাছ নামক শহরের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। ৬ হাজার মুছল্লী ধারণক্ষমতার এই মসজিদটির নির্মাণকাজ ২০১২ সালে সম্পন্ন হয়, যার গাঠনিক শৈলীতে কারুকার্যকৃত ১টি বড় ও ৪টি ছোট গম্বুজ এবং ১টি মিনার রয়েছে। মসজিদটির নামকরণ করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মক্কার বিখ্যাত শায়খ আব্দুল্লাহ ফাহিম ইবনু ইবরাহীম-এর নামানুসারে। প্রায় ২৫ মিলিয়ন মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত বা আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেখানকার সর্ববৃহৎ মসজিদ এটি।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪২ ‖ ঈসায়ী ২০২১ ‖ বঙ্গীয় ১৪২৮

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুলাই	২০ যুলকা'দাহ	বৃহস্পতিবার	০৩.৪৭	০৫.১৪	১২.০২	০৩.২১	০৬.৫০	০৮.১৭
০৫ ,,	২৪ ,,	সোমবার	০৩.৪৯	০৫.১৫	১২.০৩	০৩.২২	০৬.৫০	০৮.১৭
১০ ,,	২৯ ,,	শনিবার	০৩.৫২	০৫.১৮	১২.০৪	০৩.২৪	০৬.৫০	০৮.১৬
১৫ ,,	০৪ যুলহিজ্জাহ	বৃহস্পতিবার	০৩.৫৫	০৫.২০	১২.০৪	০৩.২৫	০৬.৪৯	০৮.১৪
২০ ,,	০৯ ,,	মঙ্গল	০৩.৫৮	০৫.২২	১২.০৫	০৩.২৭	০৬.৪৭	০৮.১২
২৫ ,,	১৪ ,,	রবি	০৪.০১	০৫.২৪	১২.০৫	০৩.২৮	০৬.৪৬	০৮.০৯

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : Universit of Islamic Science Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	-১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০
টাঙ্গাইল	-২	+১	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৬	+৫	+১
মাদারীপুর	+৩	+৩	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+৩	+২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৩	-২	+২
শেরপুর	-২	-১	+৫
জামালপুর	-১	০	+৫
নেত্রকোনা	-৪	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	০	-২	-৮
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৭
রাঙ্গামাটি	-৩	-৫	-৯
বান্দরবন	-২	-৪	-১০
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	-১	০	-৫
লক্ষীপুর	+১	+১	-৩
চাঁদপুর	+১	+১	-২
ফেনী	-১	-২	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৮	-৩
সুনামগঞ্জ	-৮	-৬	-১
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৭	+১১
নাটোর	+৪	+৫	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৫
বগুড়া	+১	+২	+৭
নওগাঁ	+৩	+৪	+৮
জয়পুরহাট	-১	-১	+১

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-১	০	+৯
দিনাজপুর	-১	+৩	+১২
গাইবান্ধা	-১	০	+৭
কুড়িগ্রাম	-৩	-১	+৮
লালমনিরহাট	-৩	-১	+৯
নীলফামারী	০	+১	+১২
পঞ্চগড়	-১	-১	+১৪
ঠাকুরগাঁও	+১	+৩	+১৪

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৭	+৬	+২
বাগেরহাট	+৭	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৯	+৮	+৩
যশোর	+৭	+৭	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৮
মাগুরা	+৫	+৫	+৪
নড়াইল	+৬	+৫	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৫	+৪	-৩
পিরোজপুর	+৬	+৫	-১
ঝালকাঠি	+৫	+৪	-১
ভোলা	+৩	+২	-৩
বরগুনা	+৭	+৫	-২

৫ম বর্ষ
৯ম সংখ্যা
জুলাই-২০২১
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৮
যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ
১৪৪২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- **প্রধান সম্পাদক,**
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- **সম্পাদনা বিভাগ :** ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- **ব্যবস্থাপনা বিভাগ :** ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- **সার্কুলেশন বিভাগ :** ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- **ই-মেইল :** monthlyalitisam@gmail.com
- **ওয়েবসাইট :** www.al-itisam.com
- **ফেসবুক পেজ :** facebook.com/alitisam2016
- **ইউটিউব :** youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- **জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :**
  ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- **জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :**
  ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- **জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :**
  ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- **জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :**
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দারসে হাদীছ
  - » শরীআতের বিষয়ে প্রশ্ন করার আদব ০৩
    -মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
- প্রবন্ধ
  - » হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১১) ০৬
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
  - » ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা (পর্ব-২০) ০৯
    -আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
  - » সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া (পর্ব-২) ১২
    -হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী
  - » লোক দেখানো আমলের পরিণতি ১৪
    -ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - » আরাফার ছিয়াম কবে রাখবেন : একটি দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা ১৬
    -আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
  - » একটি লিফলেটের ইলমী জবাব (পর্ব-২) ২০
    -আহমাদুল্লাহ
  - » হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে গরু ও প্রাণীর মাংস খাওয়ার বিধান ২৩
    -ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন)
  - » আরাফার দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত ২৮
    -মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
  - » ঈদুল আযহা : শিক্ষা ও করণীয় ৩০
    -মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
- ঈদুল ফিতরের খুৎবা
  - » আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনে কিছু উপদেশ ৩৩
    -অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন
- সাময়িক প্রসঙ্গ
  - » ইসরাঈল-ফিলিস্তীন যুদ্ধ যে কারণে শুরু হলো ও থামল! ৩৬
    -জুয়েল রানা
- নারীদের পাতা
  - » কুরআনে বর্ণিত মৌমাছির জীবনচক্রের সাথে মুমিন বান্দাদের মিল ৪০
    -মুমতাহিনা খাতুন
- কবিতা ৪৩
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪৪
- সওয়াল-জওয়াব ৪৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

জিহাদ ও উগ্রবাদ এক নয়

'জিহাদ' (جِهَادٌ) অর্থ প্রাণান্ত চেষ্টা করা। শরীআতের দৃষ্টিতে এর অর্থ দুইভাবে হয়ে থাকে: **(১) 'আম' (عَامٌّ) বা ব্যাপক:** এ অর্থে ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করা, এদিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, ইসলাম রক্ষার চেষ্টা করা, সম্ভবপর সব পথ অবলম্বন করে ইসলামকে শক্তিশালী করা ইত্যাদিকে জিহাদ বলে। **(২) 'খাছ' (خَاصٌّ) বা বিশেষ:** এ অর্থে কাফেরগোষ্ঠীর সাথে লড়াই-সংগ্রামকে জিহাদ বলে। জিহাদের উভয় অর্থই বিশুদ্ধ *(দ্র. হাজ্জ, ৭-৮; আনকাবূত, ৬; আনফাল, ৩৯; বুখারী, হা/৩০০৪; মুসলিম, হা/২৫৪৯)*। প্রথম অর্থে জিহাদ কয়েক প্রকার হয়ে থাকে: (১) ব্যক্তির নিজের নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ *(দ্র. হাজ্জ, ৭-৮; আনকাবূত, ৬)*। (২) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। (৩) যালেম, বিদআতী, ভ্রান্ত ফেরক্বা ও অপকর্মকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ। (৪) কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং (৫) মুনাফিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ। দ্বিতীয় অর্থে জিহাদ দুই প্রকার: (১) আক্রমণাত্মক (Offensive/جِهَادُ الطَّلَبِ) জিহাদ ও (২) রক্ষণাত্মক/আত্মরক্ষামূলক (Defensive/جِهَادُ الدَّفْعِ) জিহাদ। জিহাদের এসবগুলো প্রকারই ইসলামে বলবৎ রয়েছে। কেউ কেউ বলতে চান, ইসলামে জিহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক; কিন্তু তাদের একথা মোটেও ঠিক নয় *(দ্র. ফাতাওয়া ইবনে বায, ১৮/১৩৮)*।

ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ার নাম *(তিরমিযী, হা/২৬১৬, ছহীহ)*। জিহাদ সর্বোৎকৃষ্ট আমল *(বুখারী, হা/১৫২০)*। একে পবিত্র কুরআনে জাহান্নাম থেকে মুক্তকারী ব্যবসা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে *(ছফ, ১০-১৩)*। মহান আল্লাহ মুজাহিদদের মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য বিশেষ ক্ষমা ও দয়ার ঘোষণা দিয়েছেন *(নিসা, ৮৫-৫৬)*। তিনি তাদের জন্য জান্নাতে ১০০টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন, যার এক একটির ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায় *(বুখারী, হা/২৭৯০)*। শহীদের রক্তের প্রথম ক্ষরণের সাথে সাথে তার পাপ ক্ষমা করা হয়, জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়...*(ইবনু মাজাহ, হা/২৭৯৯)*। আল্লাহর রাস্তায় আহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাজা রক্ত নিয়ে আসবে, যার বর্ণ হবে লাল, কিন্তু সুগন্ধি হবে মিসকে আম্বরের *(বুখারী, হা/২৮০৩)*। শহীদের রূহ সবুজ পাখির পেটে রক্ষিত থেকে জান্নাতের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় *(মুসলিম, হা/১৮৮৭)*। জিহাদ এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য নবী ও তাদের উম্মতের উপরও তা বিধিবদ্ধ ছিল *(মায়েদা, ২০-২৬; আলে ইমরান, ১৪৬-১৪৭; নামল, ৩৬-৩৭)*। জিহাদ এমন ইবাদত, যার তামান্না প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে অবশ্যই থাকতে হবে, অন্যথা এক প্রকার মুনাফিক্বী নিয়ে মরতে হবে *(মুসলিম, হা/১৯১০)*। এগুলো জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদার নমুনামাত্র। উল্লেখ্য, ইসলামে জিহাদ মূল লক্ষ্য নয়; বরং তা আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা ও বুলন্দ করার মাধ্যম মাত্র *(তওবা, ১৪-১৬)*।

উপর্যুক্ত ব্যাপক অর্থে জিহাদ ফরযে আইন। কারণ একজন মুমিনকে প্রতিনিয়ত নিজের নাফস, শয়তান, যালেম, বিদআতী, ভ্রান্ত ফেরক্বা ও অপকর্মকারীর বিরুদ্ধে, কাফের এবং মুনাফিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে জিহাদ করে যেতে হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ অর্থে অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম হচ্ছে, তা ফরযে কিফায়াহ (فَرْضُ كِفَايَةٍ); যে সংখ্যক মুজাহিদ অংশগ্রহণ করলে যথেষ্ট হবে, তারা জিহাদে গেলে হয়ে যাবে এবং বাকীদের আর গোনাহ হবে না। আর এটা সাধারণত আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে ৪টি অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, যাতে অংশগ্রহণ করা সক্ষম প্রত্যেকটি মুসলিমের উপর ফরয: **(ক)** জিহাদে অংশগ্রহণ করে সক্ষমতা থাকা অবস্থায় সেখান থেকে পিছুটান দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই *(আনফাল, ১৫-১৬)*। রাসূল ﷺ যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোকে কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(বুখারী, হা/২৭৬৬; মুসলিম, হা/৮৯)*। সুতরাং যে জিহাদের ময়দানে চলে গেছে, তার উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। **(খ)** শত্রু কর্তৃক যখন কোনো এলাকা ঘেরাও করা হবে, তখন সেই জনপদ রক্ষা করতে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যাবে। এই ফরযে আইন সকল মুসলিমের জন্য নয়; বরং ঐ এলাকার ও আশপাশের মুসলিমদের জন্য। আর এটার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় থাকবে সরকার। এটাকে রক্ষণাত্মক/আত্মরক্ষামূলক জিহাদ বলে। **(গ)** সরকার নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে জিহাদের আদেশ করলে তার উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায় *(তওবা, ৩৮; বুখারী, হা/১৮৩৪; মুসলিম, হা/১৩৫৩)*। **(ঘ)** যখন জিহাদে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন পড়বে, যাকে ছাড়া সেই প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়, তখন তার উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে [*দ্র. আশ-শারহুল মুমতে', ৮/৭-১২; ফাওযান, আল-জিহাদ; আল-মুলাখখাছুল ফিক্বহী, ১/৪৬১*]।

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও শর্ত হচ্ছে, **(১)** জিহাদের আগে অবশ্যই দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত না দিয়ে প্রথমেই জিহাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না। নবী ﷺ মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, বিভিন্ন রাজা-বাদশা ও নেতৃস্থানীয়দের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠাতেন; তিনি আগে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে যেতেন না। **(২)** অবশ্যই জিহাদ মুসলিম সরকারের অধীনে পরিচালিত হতে হবে *(বুখারী, হা/২৯৫৭; মুসলিম, হা/১৮৪১)*। নবী ﷺ নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। আবার কখনও কাউকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনার বাইরে ছাহাবীগণ কখনও যুদ্ধে জড়াননি। তাঁর ৪ খলীফার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুসলিম শাসক নেককার হোক বা বদকার হোক হজ্জ ও জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অধীনেই পরিচালিত হবে' *(আক্বীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭১)*।

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়)

শরীআতের বিষয়ে প্রশ্ন করার আদব

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

সরল অনুবাদ : *

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘আমি তোমাদের যা নিষেধ করি, তা থেকে দূরে থাকো। আর তোমাদেরকে যা আদেশ করি, তা সাধ্য অনুযায়ী পালন করো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীগণ অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের উপর মতভেদের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে’।[১]

হাদীছটির শারঈ অবস্থান :

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘শরীআতের মৌলিক নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীছ এটি। অলংকারপূর্ণ বাক্য ব্যবহারে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের এক অন্যন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি’।[২]

ইবনু হাজার আল-হায়ছামী রহিমাহুল্লাহ এটিকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্যতম মূলভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন। এটি মুখস্থ করা এবং এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য।[৩]

মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাবশীরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘অলংকারপূর্ণ বাক্যের অন্যতম এটি। শরীআতের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এটি’।[৪]

আল্লামা ইবনু আল্লান রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইসলামী বিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির একটি এটি। আলংকারিক বাক্যের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত এটি। কেননা এটি অগণিত শারঈ বিধিবিধানকে শামিল করে’।[৫]

হাদীছটির শিক্ষণীয় দিক :

(১) আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, তা করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

(২) মানুষ যা করতে সক্ষম, তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই অপরিহার্য নয়।

(৩) দ্বীন ইসলামের সহজতা, যেখানে সক্ষমতার অতিরিক্ত মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

(৪) সকল নিষেধাজ্ঞা বর্জন না করলে শরীআতের পরিপূর্ণ অনুসরণ হয় না।

(৫) আদিষ্ট বিষয়ের কোনো কিছু পালনে অসমর্থ হলে সক্ষমতানুযায়ী যতটুকু আদায় করতে পারবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

(৬) এমন প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ, যাতে কোনো উপকার নেই।

(৭) নবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর উপর মতভেদ ধ্বংসের কারণ। কেননা এই কারণে আমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা :

মানবতার জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবনবিধান হচ্ছে ইসলাম। এটি আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ চূড়ান্ত জীবনবিধান, যা ব্যতীত অন্য কোনো বিধান তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আদেশ ও নিষেধের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই জীবনবিধান। এটি প্রত্যেক কল্যাণকর বা উত্তম কাজের আদেশ দেয় এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর বা নিকৃষ্ট কাজ থেকে বাধা দান করে।

একজন আদর্শ প্রশ্নকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, কোন প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করতে হবে, আর কোন প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করা হতে বিরত থাকতে হবে, সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এখানে। আমরা যদি হাদীছটি আলোচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টি দেই, তাহলে সেটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুৎবায় বললেন, ‘হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। অতএব, তোমরা হজ্জ করো’। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! প্রতিবছরই কি (হজ্জ করতে হবে)? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এমনকি ঐ ব্যক্তি এই প্রশ্ন তিন বার করলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তোমাদের জন্য (হজ্জ) অপরিহার্য হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতে না। যে সমস্ত বিষয়ে আমি তোমাদের এড়িয়ে যাই (প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চাই না), সেক্ষেত্রে তোমরা আমাকে ছেড়ে দিবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেশি বেশি প্রশ্ন এবং নবীদের সম্পর্কে মতভেদের

---

* প্রভাষক, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭।

২. নববী, শারহে মুসলিম (আল-মিনহাজ), ৯/৮৬

৩. ফাতহুল মুবীন, পৃ. ১১৯।

৪. আল-জাওয়াহিরুল বাহিয়্যা শারহুল আরবাইন আন-নববীআ, পৃ. ১০৬।

৫. দালীলুল ফাতিহীন, পৃ. ৬৫।

কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন আমি তোমাদের কোনো কাজের আদেশ দেই, তোমরা তা তোমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী পালন করো। আর যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তোমরা তা বর্জন করো'। অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, 'যেসব বিষয়ে আমি তোমাদের এড়িয়ে যাই, সেসব বিষয় সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো না'।[৬]

প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা বলতে কি সর্বক্ষেত্রে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে?

প্রশ্ন করা হতে বিরত থাকা বলতে সর্বক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হতে বিরত থাকা উদ্দেশ্য নয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে। কেননা, সত্য অন্বেষণ করা একজন মুমিনের একমাত্র ব্রত হতে হবে। সত্যের সন্ধানে তাকে সাধনা করতে হবে। তবে প্রশ্ন করার সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যেন ইনছাফের ব্যত্যয় না ঘটে। সৎ উদ্দেশ্যের কোনো রকম লক্ষ্যচ্যুত না হয়।

যেসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা জরুরী :

(১) যে প্রশ্নে কোনো কল্যাণ নেই; বরং উল্টো মতভেদ সৃষ্টি করে।

(২) যে প্রশ্নের কারণে মন্দ অনুপ্রেরণা, বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতা, কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়।

(৩) জেদের বশবর্তী হয়ে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা।

(৪) যে প্রশ্নের কারণে প্রশ্নকারীর মনে ইসলামের পূর্ণতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।

(৫) দ্বীনী বিষয়ে এমন প্রশ্ন করা, যার কারণে প্রশ্নকারীর শিরকে পতিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

(৬) হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা।

(৭) অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা বা পরিবেশ বা অবস্থার আশঙ্কা তৈরি হয় এমন প্রশ্ন।

(৮) সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ির কারণ হয় এমন প্রশ্ন।

(৯) শরীআতে যেখানে প্রশস্ততা রয়েছে, সেখানে সংকুচিত অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমরা যখন ছাহাবীদের পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন তাদের প্রশ্নগুলোকে দুই ভাগে দেখতে পাই-

(ক) এমন সব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা, যে সম্পর্কে তাদের চিন্তা সৃষ্টি হয় বা তাদের মনে প্রশ্ন করার কিংবা জানার আগ্রহ তৈরি হয়। এই জাতীয় প্রশ্ন করতে শরীআতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জানতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 'যদি তোমরা না জানো তবে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জেনে নাও' *(আন-নাহল, ১৬/৪৩)*। এখান থেকেই ছাহাবীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, তারা কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করবেন। যেমন :

(১) ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পড়ে গেলে সে ঘি খাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন।

(২) রাস্তায় প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার বা ভোগ সম্পর্কে প্রশ্ন।

(৩) সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন ইত্যাদি।

(খ) এমন সব বিষয় সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করা, যার বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার প্রত্যাশা করা যায়। যেমন :

(১) রাফে' ইবনু খাদীজ রাযিয়াল্লা-হু আনহু আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট যে অস্ত্র আছে, তা শত্রুর মোকাবিলায় ব্যবহার করতে হবে। আমাদের হাতে তরবারি ব্যতীত পশু যবেহ করার জন্য কোনো ছুরি নেই। এখন আমরা কী করব? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, রক্ত প্রবাহিত হয় এমন বস্তু দ্বারা যবেহকৃত এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে এমন প্রাণী তোমরা খাও। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা যবেহ করা যাবে না।

(২) দাজ্জালের সময় যখন এক দিন এক বছরের সমান হবে, তখন ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা তার জন্য সময় নির্ধারণ করে নিবে। শারীআতের আহকাম ও দলীল অনুযায়ী আমল করার পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলিমদের জন্য দিকনির্দেশনা রয়েছে এই হাদীছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আর এটাই শারঈ বিধানের মূল দাবি। কেননা নিষেধের মূল কথা হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা, যা রাসূল ﷺ-এর বাণী, 'আমি তোমাদের যে বিষয়ে নিষেধ করি তা থেকে বেঁচে থাকো'।[৭] আর আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 'রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো আর তিনি তোমাদের যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো' *(আল-হাশর, ৫৯/৭)*। এতে স্পষ্ট হয়েছে। অতএব, শরীআতের নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিষেধকৃত সকল বিষয় অবশ্যই হারাম হিসাবে গণ্য হবে। তবে মাকরূহ হওয়ার প্রমাণ থাকলে তা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হিসাবে গণ্য হবে। কাজেই তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা আর যা করতে

৬. তিরমিযী, হা/২৬৭৯, হাদীছ ছহীহ।

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭।

বলেছেন, সাধ্যমতো তা করা এবং হালাল-হারামের যে বিধান তিনি এনেছেন, তা নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা আমাদের উপর ফরয। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল’ *(আন-নিসা, ৪/৮০)*। নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে (اجْتَنَبُوا) শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি এমন একটি শব্দ, যা কোনো বস্তু হতে দূরে থাকার অর্থ দিয়ে থাকে। বিষয়টি এমন যে, তুমি যেন একপার্শ্বে অবস্থান করছ আর হারাম অন্যপাশে অবস্থান করছে। এই কারণেই এটি বিরত থাকা বা বর্জন করার অর্থকে অধিক অর্থবোধক করে প্রকাশ করেছে।

আদিষ্ট বিষয় সম্পাদনে শারঈ বিধান হলো, আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেছেন, তার মধ্যে যা পালন করা সম্ভব এবং যা সক্ষমতার সীমার মধ্যে থাকে, তা পালন করা। যখনই কেউ কোনো বিধান পালনে অপারগ হয়, তখনই শরীআত তার দায়িত্ব হালকা করে দেয়। এটি ইসলামের সহজতা ও উদারতার প্রমাণ। যেমন কুরআনুল কারীমে এসেছে, ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি সহজ করতে চান; তোমাদের প্রতি কঠোর করতে চান না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। তিনি আরেও বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যতটা সম্ভব’ *(আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)*। যেমন কেউ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ে অক্ষম হলে বসে আর বসে অক্ষম হলে শুয়ে আদায় করবে। এমনকি নিরুপায় হলে হারাম খাদ্যও তার জন্য অনুমোদিত। উল্লেখ্য, এই অর্থের উপর ভিত্তি করেই উলামায়ে কেরাম গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী মৌলিক বিধান তৈরি করেছেন। আর তা হচ্ছে, الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ ‘কষ্টই সহজতার পথ উন্মুক্ত করে দেয়’। এটিকে তারা এমন উৎস মনে করেন, যার ওপর ভিত্তি করে ফিক্বহ শাস্ত্রের বহু মাসআলার উদ্ভব ঘটে।

এখানে স্মর্তব্য যে, শরীআত আদেশকৃত বিষয়ের তুলনায় নিষেধকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। তাই আদেশ বাস্তবায়ন সক্ষমতার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে নিষিদ্ধ বিষয় সক্ষমতার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি, বরং তা আদায়ে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। কেননা শরীআত সর্বদা পাপে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। সমাজে পাপ ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত বিষয়কে হারাম করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকা ব্যতীত এটি সম্ভব নয়। এই কারণে আল্লাহ তাআলা তার প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনে ঘোষণা করেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না’ *(আন-নূর, ২৪/২১)*। হারামে পতিত হওয়ার সকল উপকরণকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। কাজেই যেটা সরাসরি হারাম, সেটা তো নিষিদ্ধ হওয়া আরো বেশি যৌক্তিক।

সুধী পাঠক! উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বর্তমান সময়ে নামধারী অনেক মুসলিম পাপের মধ্যে ডুবে আছে। তাদেরকে ইবাদত পালনে যথেষ্ট সচেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু হারাম থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে তারা মোটেও সতর্কতা অবলম্বন করে না। মানুষ যখন ইবাদত করে, তারাও তখন মানুষের সাথে ইবাদত করে। কিন্তু যখন বাসায় ফিরে আসে, তখন পাপ ও অবাধ্যতার কাজে লিপ্ত হতে তারা মোটেও ভয় করে না। তখন তারা আল্লাহকে ভুলে যায় অথবা ভ্রান্তির ছলনা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে উপদেশ দিয়ে বলেন, ‘তোমরা অবশ্যই হারাম থেকে বেঁচে থাকবে, তবে তোমরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত আদায়কারী হিসাবে বিবেচিত হবে’।[৮] এর দ্বারা ইবাদত পালনে তাচ্ছিল্য কিংবা শৈথিল্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য নয়। বরং হারাম থেকে বিরত থাকার জন্য চরমভাবে সতর্ক করা, যা হাসান বাছরীর মন্তব্যে আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন, ‘মানুষ যত আমল করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো আল্লাহ তাআলা যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা’।[৯]

এই হাদীছ যেসব অর্থের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষকে দ্বীনের বিধানানুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে জেদি বা কঠোর করে গড়ে তোলা। এর প্রমাণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ - ‘নিশ্চয়ই এটি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী চূড়ান্ত বাণী। আর এটি কোনো কৌতুকের বিষয় নয়’ *(আত্ব-ত্বারিক, ৮৬/১৩-১৪)*। এই চ্যালেঞ্জ মানুষকে একথার প্রতি আহ্বান করে যে, শারঈ দৃষ্টিতে উপকারী হিসাবে যা কিছু সে জানে, তার সম্পূর্ণটাই গ্রহণ করা তার জন্য অপরিহার্য। তার জীবনের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের প্রতিবন্ধক সকল বিষয় থেকে মুক্ত হতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। আত্মার প্রশিক্ষণ এবং বিশুদ্ধকরণের চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

এমনকি আল্লাহর রাসূল ﷺ এই বিধান তাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করতে সক্ষম হন। তিনি এই সূক্ষ্ম বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেছেন। এর প্রভাবেই পূর্ববর্তী উম্মত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

[‘দারসে হাদীছ’-এর বাকী অংশ ৩২ নং পৃষ্ঠায়]

৮. মুসনাদে আহমাদ, হা/৮০৯৫; তিরমীযী, হা/২৩০৫, ‘হাসান’।
৯. আল-মাক্বসূদ মিন তাফযীলে তারকিল মুহাররামাত আলা ফিআলিত ত্বআত।

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১১)

উমরা ও হজ্জের বিস্তারিত বিবরণ

এক নযরে উমরার কার্যাবলি :

(১) ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে মীক্বাত হতে মনে মনে উমরার নিয়্যত করে 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান' বলে ইহরাম বাঁধা।

(২) মক্কায় পৌঁছে পবিত্র হয়ে ওযূ করে কা'বায় সাত বার ত্বাওয়াফ করা এবং ত্বাওয়াফ শেষে দুই রাকআত ছালাত আদায় করা।

(৩) ছাফা ও মারওয়ায় সাত চক্কর সাঈ করা।

(৪) পুরুষের মাথা ন্যাড়া করা অথবা চুল ছোট করা এবং হালাল হওয়া। আর মহিলাদের চুলের আগা হতে কিছু অংশ কেটে হালাল হওয়া।

এক নযরে হজ্জের কার্যাবলি :

(১) ইফরাদ এবং ক্বিরান হজ্জের ইহরাম বেঁধে কা'বায় সাতবার ত্বাওয়াফে কুদূম এবং ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার সাঈ করা। আর তামাত্তু হজ্জের জন্য মক্কায় অবস্থানরত হাজীদের নিজ বাসস্থান হতে ৮ যিলহজ্জে ইহরাম বাঁধা।

(২) ৮ তারিখে মিনায় যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা এবং সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা।

(৩) ৯ তারিখে সূর্য উদিত হওয়ার পর আরাফায় গমন করা। যোহরের সময় হলে এক আযানে এবং দুই ইক্বামতে যোহর ও আছরের ছালাত ক্বছর করে একত্রে আদায় করা। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।

(৪) মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করে রাত্রিযাপন করা এবং ফজর ছালাত আদায়ের পর ফর্সা হলে সূর্য উদিত হওয়ার আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া।

(৫) মিনায় পৌঁছে বড় জামরায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করা। কুরবানী সম্পন্ন করে মাথার চুল ন্যাড়া অথবা ছোট করে প্রথম হালাল হওয়া। তারপর কা'বায় ত্বাওয়াফ ও সাঈ করে পূর্ণ হালাল হওয়া।

(৬) ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে মিনায় রাত্রিযাপন করা এবং প্রত্যেক দিন সূর্য ঢলার পরে তিনটি স্থানে ২১টি করে পাথর নিক্ষেপ করা।

(৭) বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে বিদায়ী ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করা।

বিস্তারিত বিবরণ :

১. ইহরামের প্রস্তুতি : কোনো মুসলিম উমরা বা হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করলে ইহরাম বাঁধার পূর্বে নখ, চুল ইত্যাদি কেটে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো। তবে কুরবানী করার ইচ্ছা থাকলে নখ, চুল ইত্যাদি কাটতে পারবে না। এ কারণে চাঁদ দেখার আগেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। মীক্বাত বা ইহরাম বাঁধার স্থানে গিয়ে ওযূ-গোসল সম্পন্ন করে ইহরামের পোশাক পরিধান করতে হবে। আর যদি মীক্বাত দূরে হয় অথবা মীক্বাতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে বিমানে ইহরাম বাঁধবে এবং আগেই ওযূ-গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আর এ সময় মহিলারা যদি হায়েয বা নিফাস অবস্থায় থাকে, তাহলেও তারা গোসল করে নিবে এবং মীক্বাতে পৌঁছালে অথবা মীক্বাত বরাবর হলে ইহরাম বাঁধবে।

২. ইহরাম বাঁধা : উমরা ও হজ্জের প্রথম রুকন হলো ইহরাম বাঁধা। উমরা ও হজ্জের ইহরামের জন্য অন্তরে নিয়্যত করে মৌখিকভাবে হাদীছে বর্ণিত শব্দগুলো পাঠ করতে হবে। শুধু উমরা করলে অন্তরে নিয়্যত করে মুখে পাঠ করবে, لَبَّيْكَ عُمْرَةً 'লাব্বাইকা উমরাতান' ক্বিরান হজ্জ হলে অন্তরে নিয়্যত করে বলবে, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا 'লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান'। আর ইফরাদ হজ্জ হলে অন্তরে নিয়্যত করে মৌখিকভাবে বলবে, لَبَّيْكَ حَجًّا 'লাব্বাইকা হজ্জান'। আর لَبَّيْكَ শব্দের পরে اَللّٰهُمَّ 'আল্লাহুম্মা' শব্দ বলা যায়।[১]

৩. ইহরাম বাঁধার সময় অসুস্থ হলে বা সমস্যায় পড়লে করণীয় : ইহরাম বাঁধার সময় অসুস্থ হলে বা কোনো সমস্যা মনে করলে ইহরামে শর্ত যুক্ত হতে পারে। ইহরামের শব্দগুলো আগের মতই বলবে। তারপরে শর্ত হিসেবে এই শব্দগুলো যোগ করতে হবে তখন ইহরামের শব্দগুলো এভাবে বলতে হবে, اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ 'হে আল্লাহ! আমি উমরার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি। যেখানে আমি কোনো বাধার সম্মুখীন হই, সেখানেই আমাকে বাধাগ্রস্ত করো। সেটাই আমার ইহরাম হতে হালাল হওয়ার স্থান'।[২]

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৭০।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৮৯।

৪. ইহরামের ছালাত : ইহরামের জন্য কোনো ছালাত নেই। নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জের ইহরাম ফরয ছালাতের পর বেঁধেছেন। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল ﷺ যুলহুলায়ফাতে কছর করে দুই রাকআত ফরয ছালাত আদায় করেন। তারপর তিনি যুলহুলায়ফা মসজিদের পাশে বাহনে আরোহণ করেন এবং ইহরামের বাক্যগুলো পাঠ করেন।[৩] যে কোনো মীক্বাতের মসজিদে প্রবেশ করে শুধু মসজিদের হক্ব হিসাবে দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে। তবে শুধু মদীনার মীক্বাত যুলহুলায়ফার মসজিদে দুই রাকআত ছালাত আদায় করার নিয়ম রয়েছে। কারণ যুলহুলায়ফা স্থানটি 'আক্বীক্ব' নামক স্থানে অবস্থিত। আর 'আক্বীক্বে' নবী করীম ﷺ-কে দুই রাকআত ছালাত আদায়ের জন্য আদেশ করা হয়েছে। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে 'আক্বীক্ব' উপত্যকায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছি, أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ 'আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন আগন্তুক এসে বললেন, আপনি এই বরকতময় উপত্যকায় ছালাত আদায় করুন এবং বলুন, উমরা চিরদিনের জন্য হজ্জের অন্তর্ভুক্ত'।[৪]

(৫) ঋতুবতী মহিলার ইহরাম : মীক্বাতে পৌঁছে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আসা কোনো মহিলার হায়েয বা নিফাস শুরু হলে ভালোভাবে গোসল সম্পন্ন করে মীক্বাতেই ইহরাম বাঁধবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় বছর (মাদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হজ্জ করেননি। অতঃপর দশম হিজরীতে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছর হজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোকের আগমন হলো। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করতে এবং তার অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিলেন। আমরা তার সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন যুলহুলায়ফাহ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আসমা বিনতু উমায়স (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, এখন আমি কী করব? তিনি বললেন, اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي 'তুমি গোসল করো, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো'।[৫]

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলারা ইহরাম বাঁধতে পারে। বিমানে যাত্রা করলে আরোহণের পূর্বে গোসল করে নিবে। গোসল করা সম্ভব না হলে ওই অবস্থায় ইহরাম বাঁধবে। মক্কায় পৌঁছে পবিত্র না হলে ত্বাওয়াফ ছাড়া হজ্জ ও উমরার বাকী সব কাজ করবে। এরপর পবিত্র হলে গোসল সম্পন্ন করে ত্বাওয়াফ করবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যেই (মদীনা হতে) বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছার পর আমার হায়েয আরম্ভ হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং বললেন, কী হলো তোমার? তোমার হায়েয আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'এটা তো আল্লাহ তাআলাই আদমের কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব কাজ করে যাও'।[৬] এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, হায়েয অবস্থায় হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। যখন হায়েয অবস্থা হতে মুক্ত হবে, তখন ত্বাওয়াফ করে নিবে।

(৬) ছোট বাচ্চার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধা বিধান :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, নবী করীম ﷺ রাওহা নামক স্থানে এক কাফেলার সাথে মিলিত হন। তিনি বলেন, আপনারা কে? তারা বললেন, আমরা মুসলিম। তারা বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল। তখন একজন মহিলা একটি বাচ্চা উঠিয়ে ধরলেন এবং বললেন, এ বাচ্চার জন্য হজ্জ রয়েছে কি? নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তার জন্য হজ্জ রয়েছে। তবে নেকী আপনার হবে।[৭] এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, অভিভাবক তাদের ছোট বাচ্চাদের নিয়ে হজ্জ করতে পারে।

(৭) বদলি হজ্জ ও উমরা করার পূর্বে নিজে তা করা : এ অবস্থায় অবশ্যই নিজের হজ্জ বা উমরা আগে করতে হবে। ইহরাম বাঁধার সময় 'লাব্বাইকা উমরাতান আন....' বলে যার হজ্জ বা উমরা, তার নাম বলবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল ﷺ একজন লোককে বলতে শুনলেন, 'লাব্বাইকা আন শুবরুমা' (আমি শুবরুমার পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছি। নবী করীম ﷺ বললেন, শুবরুমা কে? তিনি বললেন, আমার ভাই অথবা আমার নিকটাত্মীয়। তখন

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৮৪; মিশকাত, হা/২৫৫১।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৩৪।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৪।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৬; মিশকাত, হা/২৫১০।

www.al-itisam.com

নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি তোমার পক্ষ থেকে হজ্জ করেছ? লোকটি বললেন, না। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আগে তোমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।[৮] এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, কেউ কারো পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরা আদায় করতে পারে এবং এভাবে হজ্জ-উমরা করতে চাইলে নিজের হজ্জ-উমরা আগে সম্পন্ন করতে হবে।

(৮) মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করার বিধান : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জ করতে হবে।

عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ رَجُلٌ مِنَ الْفُرْعِ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حِجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ.

আবূ গাউছ ইবনু হুছাইন বলেন, একজন লোক তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তার পিতার উপর হজ্জ ফরয ছিল। তার পিতা হজ্জ না করে মারা গেছে। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো'।[৯] অতএব, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে এবং অতিবৃদ্ধ আরোহণে অক্ষম এবং এমন অসুস্থ যার সুস্থতার আশা করা যায় না, এমন সব ব্যক্তির পক্ষ হতে বদলি হজ্জ করা যায়। তবে কোনো জীবিত সুস্থ-সবল ব্যক্তির পক্ষ হতে বদলি হজ্জ ও উমরা করা যাবে না।

(৯) পুরুষ ব্যক্তির শুধু দুটি কাপড়ে ইহরাম বাঁধা : পুরুষ ব্যক্তি শুধু দুটি কাপড়েই ইহরাম বাঁধবে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের পুরুষেরা ইহরাম বাঁধবে দুটি কাপড়ে। একটি লুঙ্গি অপরটি চাদর এবং পায়ে দুটি জুতা'।[১০] ইহরামের কাপড় ময়লা হলে পরিবর্তন করতে পারবে। প্রয়োজনে কাপড় পরিষ্কার করতে পারে। ইহরাম অবস্থায় গোসল করা যায়। নাফে' (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা) যুলহুলায়ফায় ফজরের ছালাত শেষ করে বাহন প্রস্তুত করার আদেশ করতেন। প্রস্তুত হলে আরোহণ করতেন। বাহন তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সোজা কেবলামুখী হয়ে হারামের সীমারেখায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। তারপর বিরতি দিয়ে 'যু-তুওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে ভোর পর্যন্ত রাত্রিযাপন করতেন। তারপর ফজরের ছালাত আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরূপ করেছিলেন।[১১] এই হাদীছ প্রমাণ করে, ইহরাম বাঁধার পর গোসল করা যায়। এখানে মহিলাদের ইহরামের পোশাক সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(১০) মীক্বাতে ইহরাম বাঁধা : হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশকারীকে অবশ্যই মীক্বাতে ইহরাম বাঁধতে হবে। যারা মীক্বাত এবং মক্কার মাঝে অবস্থান করে তারা নিজ স্থান হতে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে।[১২] হজ্জ ও উমরা পালনকারী যে কোনো ব্যক্তি ইহরামের স্থান অতিক্রম করলে পুনরায় তাকে ইহরাম বাঁধার স্থানে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। ভেতরে ইহরাম বাঁধলে দম ওয়াজিব হবে। কেননা নির্ধারিত স্থানে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

(চলবে)

---

৮. আবূ দাঊদ, হা/১৮১১, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৫২৯।

৯. ইবনু মাজাহ, হা/২৯০৫।

১০. মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৮৯৯।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৫৩।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/১৫২৪।

সংশোধনী

মাসিক আল-ইতিছাম, জুন-২০২১ এর 'হজ্জ ও উমরা' প্রবন্ধের দ্বিতীয় হাদীছে বলা হয়েছে, 'আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম'। এখানে 'বাঁধা অবস্থায়' এর পরিবর্তে 'বাঁধার পূর্বে' হবে।
এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

- চাঁপাই ম্যাংগো সার্ভিস -
১০০% ফরমালিন মুক্ত চাঁপাই ম্যাংগো পরিষেবা

ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্ষিরসাপাত/ হিমসাগর, গোপালভোগ, ল্যাংড়া, আম্রপালি, ফজলি, সুরমা ফজলি, লক্ষণভোগ, আশ্বিনা ইত্যাদি আম সরবরাহ করা হয়।

আমাদের আমের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

* ১০০% ফরমালিনমুক্ত আম।
* সরাসরি বাগান থেকে আম সংগ্রহ করা হয়।
* গাছে আম পাকা শুরু হবার পর থেকে সংগ্রহ করা হয়।
* প্রতিটি আম স্বাস্থ্যসম্মত পরিপক্ক।
* শতভাগ নিরাপদ আম।

প্রোপা : মোঃ আনোয়ার
কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
মোবাইল নং : ০১৭২২-৮৫৬৬৭০

ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-২০)

(২) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের সৃষ্টি : আমাদের সমাজের বহুল প্রচলিত আরেকটি আক্বীদা হচ্ছে, নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের সৃষ্টি। পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের দেশের বহু সংখ্যক মুসলিমের আক্বীদা-বিশ্বাস এটাই। আরো দুঃখের বিষয় হলো, একশ্রেণির নামধারী আলেম এই ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার ও প্রসারের ফেরিওয়ালা সেজেছে; যারা এ মতের পক্ষে কুরআনের কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যা করছে এবং কিছু জাল হাদীছকে দলীল হিসেবে পেশ করছে। যাহোক, এই আক্বীদা পোষণকারীদের বেশিরভাগই নিজেদের হানাফী পরিচয় দেওয়ায় একে 'হানাফী আক্বীদা' বলে ধারণা করা হয়। যদিও ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদার সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক থাকবেই-বা কী করে! যে আক্বীদা কুরআন ও হাদীছের সরাসরি বিরোধী, তার সাথে কি ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর সম্পর্ক থাকতে পারে?! কখনই না; বরং এর সাথে কোনো মুসলিমের সম্পর্ক থাকতে পারে না। 'নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি'— এ আক্বীদা 'হানাফী আক্বীদা' হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, হানাফী মাযহাব অনুসরণের দাবীদার বিভ্রান্ত ব্রেলবীরা উক্ত আক্বীদা মনেপ্রাণে ধারণ করে। বরং তাদের মাধ্যমেই এ আক্বীদা ভাইরাসের মতো ছড়িয়েছে। আর তারা আমাদের সমাজের সাথে মিশে থেকে এই আক্বীদার প্রচার-প্রসার চালায় বিধায় সাধারণ জনগণ এটাকে 'হানাফী আক্বীদা' বলে মনে করে ও বিশ্বাস করে। কারণ তারা প্রায় সবাই হানাফী। উল্লেখ্য, মুসলিমদের দু'টি প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত' ও 'সুন্নী'; আমাদের সমাজের ব্রেলবীরা নিজেদের ক্ষেত্রে এই নাম দু'টি ব্যবহার করে পর্দার পেছনে নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদা লুকিয়ে রাখে এবং এই অপকৌশলের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারিত করাও সহজ হয়। তারা রেজভী নামেও পরিচিত। নিজেদের ছূফী পরিচয়দানকারী কিছু ব্যক্তি-গোষ্ঠীও উক্ত আক্বীদা প্রচার করে থাকে।

আশ্চর্য ব্যাপার হলো, যুগে যুগে মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম আগমন করায় তাঁদের সম্প্রদায় তাঁদেরকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের অস্বীকারের কারণ ছিল, নবী-রাসূল কেন মানুষ হবেন?! তাদের তো ফেরেশতা হওয়া উচিত ছিল! মহান আল্লাহ এ চরম সত্য তুলে ধরেছেন এভাবে, ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ 'যখন তাদের নিকট হেদায়াত এসেছিল, তখন মানুষদেরকে এই উক্তিই ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছিল যে, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' *(বানু ইসরাঈল, ১৭/৯৪)*। অথচ সেই বেঈমান সম্প্রদায়গুলোর এই আক্বীদাটাও মুসলিম নামধারী এই মানুষগুলো গ্রহণ করতে পারছে না! অন্য দিক দিয়ে বলা যায়, সেই সব কাফের যেমন মানুষ নবী-রাসূলকে গ্রহণ করতে পারেনি, এরাও তেমনি মানুষ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না!

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মতো মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন। তিনি রক্ত, গোশত, হাড় ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। তিনি খানাপিনা করতেন। তার স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ছিল। তিনি হাটে-বাজারে যেতেন। অন্যান্য মানুষের মতো তারও রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, ক্লান্তি, ঘুম, হাঁচি, হাই, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি হতো। এগুলো কি মানবীয় গুণ নয়? তিনি যে মাটির মানুষ ছিলেন, তার পক্ষে কুরআন, হাদীছ ও উলামায়ে কেরামের অসংখ্য বক্তব্য পেশ করে কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। দুয়েকটি বক্তব্য পেশ করে প্রসঙ্গটির যবনিকাপাত টানতে চাই। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ 'বলে দাও, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজন' *(আল-কাহফ, ১৮/১১০; হা-মীম আস-সাজদাহ, ৪১/৬)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي﴾ 'আমি তো কেবল তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমনভাবে তোমরা ভুলে যাও। অতএব, আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও'।[১]

ইবনু হাযম আল-আন্দালুসী রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَأَنَّ جَمِيعَ النَّبِيِّينَ وَعِيسَى وَمُحَمَّدًا - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - عَبِيدًا لِلَّهِ تَعَالَى مَخْلُوقُونَ؛ نَاسٌ كَسَائِرِ النَّاسِ؛ مَوْلُودُونَ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى؛ إلَّا آدَمَ وَعِيسَى 'সকল নবী, ঈসা ও

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭২।

www.al-itisam.com

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি। তাঁরা অন্যান্য মানুষের মতোই মানুষ। পুরুষ-নারীর ঔরশে ভূমিষ্ট— আদম ও ঈসা ছাড়া (এ দু'জন পুরুষ-নারীর ঔরশে ভূমিষ্ট নন)'।[২] শায়খ উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, নবী ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর, তিনি মানুষ নন, তিনি গায়েব জানেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে কাফের। সে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর দুশমন। সে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর অলী নয়। কারণ তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সে কাফের...'।[৩]

অতএব, এ কুফরী আক্বীদা ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর আক্বীদা হতে পারে না— সমাজে যতই তা প্রচারিত ও প্রচলিত হোক না কেন এবং যেই তা প্রচার করুক না কেন।

(৩) রাসূল ﷺ গায়েব জানেন : শুধু কি রাসূল ﷺ গায়েব জানেন? বরং অনেক অলী-আউলিয়াও গায়েব জানেন!— এই হচ্ছে আমাদের দেশের একশ্রেণির মানুষের বিশ্বাস! আর এই আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণকারীর একটি বড় অংশ হানাফী হওয়ায় এটাকে মানুষ 'হানাফী আক্বীদা' বলে জানে। অথচ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এই আক্বীদা কস্মিনকালেও ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর আক্বীদা হতে পারে না। আল-ফিক্বহুল আকবার গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এসেছে, وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَصْرِيْحًا بِالتَّكْفِيْرِ بِاعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} 'নবী ﷺ গায়েব জানেন— এই বিশ্বাসকে হানাফীরা স্পষ্টভাবে কুফর আখ্যা দিয়েছেন। কেননা এটা নিম্নবর্ণিত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক— ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ 'বলে দাও, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না' *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*।

তবে গায়েবের বিষয়টা একটু বিশ্লেষণের দাবী রাখে। কারণ কুরআন-হাদীছের কিছু বক্তব্যকে নিজের মতো করে বুঝে তারা উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা লালন করে এবং ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করে। গায়েবের খবরকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(ক) গায়েব মুত্বলাক্ব (غَيْبٌ مُطْلَقٌ) : এ প্রকার গায়েবের খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। একমাত্র তিনিই এর খবর রাখেন। কাউকেই তিনি এ সম্পর্কে অবহিত করেন না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ 'বলে দাও, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না' *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ 'আর তার কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া আর কেউ সে সম্পর্কে জানে না' *(আল-আনআম, ৬/৫৯)*। অন্য আয়াতে আরো এসেছে, ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ 'আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে' *(হূদ, ১১/১২৩)*। এই গায়েবের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর না জানার ব্যাপারটা দ্ব্যর্থহীনভাবে জনগণকে জানিয়ে দিতে মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে, ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ 'বলে দাও, আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৮৮)*। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَقَدْ كَذَبَ 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, তিনি (নবী ﷺ) গায়েবের খবর জানেন, সে মিথ্যা বলবে'।[৪] এরকম আরো বহু আয়াত ও হাদীছ রয়েছে, যেগুলো উল্লেখ করে আলোচনা লম্বা করতে চাই না। তবে যতটুকু উল্লেখ করেছি, ততটুকু এখানকার জন্য যথেষ্ট ইনশা-আল্লাহ।

(খ) গায়েব নিসবী (غَيْبٌ نِسْبِيٌّ) : যে গায়েবের খবর মহান আল্লাহ নবী, রাসূল, ফেরেশতাসহ তার কোনো কোনো প্রিয় বান্দাকে অবহিত করেন, তা এ প্রকার গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার গায়েব কেউ জানে আবার কেউ জানে না, তাই তো একে গায়েব নিসবী বা আপেক্ষিক গায়েবের জ্ঞান বলে। এ প্রকার গায়েবের জ্ঞান কোনোটা বৈধ আবার কোনোটা হারাম। আবার তা বৈধ বা অবৈধ উভয় পন্থায় অর্জন করা যায়। সেকারণে এ প্রকার গায়েবের জ্ঞানের ধরন ও অর্জনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে তবেই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোনটা গ্রহণ করব আর কোনটা গ্রহণ করব না। তদুপরি এ ব্যাপারে যত ভণ্ডামি আছে, তা থেকে সাবধান থাকতে হবে। যাহোক, এ প্রকার গায়েব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ 'তিনি অদৃশ্যের

২. আল-মুহাল্লা, (দারুল ফিকর, বৈরূত, তা. বি.), ১/২৯।
৩. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন, ১/৩৩৩।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৮০।

জ্ঞানী। আর তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তবে তার মনোনীত রাসূল ছাড়া' *(আল-জিন, ৭২/২৬-২৭)*। অতএব, মহান আল্লাহ তার অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ যাকে জানান, কেবল তিনি ততটুকু জানেন; এর বাইরে কারো গায়েবের খবর জানা সম্ভব নয়।

(৪) রাসূল ﷺ জীবিত : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর প্রায় ১৫০০ বছর পরে এসেও 'রাসূল ﷺ জীবিত, না-কি মৃত?' —এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, এ ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে জড়াতে হয়, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে! যে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে গেছেন খোদ প্রথম খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু, তা নিয়ে নতুন করে বিতর্কে জড়ানো পরিতাপের বিষয় নয় কি?

ঘটনা হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু ছাহাবায়ে কেরামের জন্য বজ্রপাতের চেয়েও কঠিন ছিল। এ খবরে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কেউ-বা শোকে মুহ্যমান হয়ে যান, কেউ-বা অধিক শোকে পাথর হয়ে পড়েন। কেউ আবার প্রথম অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু অস্বীকার করেই বসেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, 'রাসূল ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু (মদীনার) আলিয়া অঞ্চলে ছিলেন। এদিকে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলতে থাকেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা যাননি। আল্লাহর কসম! সে সময় আমার মনে একথা ছাড়া অন্য কিছু আসছিল না। আমার আরো মনে হচ্ছিল যে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তিনি কিছু মানুষের হাত-পা কেটে ফেলবেন (যারা বলছে যে, তিনি মারা গেছেন)।

এরপর আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু আসলেন এবং রাসূল ﷺ-এর মুখমণ্ডলের আবরণ সরিয়ে চুমু খেয়ে বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! ধন্য আপনার জীবন, ধন্য আপনার মৃত্যু। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ কস্মিনকালেও আপনাকে দু'বার মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবেন না। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, হে কসমকারী! শান্ত হও। এরপর আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু যখন কথা শুরু করলেন, তখন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু চুপ হয়ে গেলেন। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। এরপর আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ আয়াতটি পড়লেন, ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ 'নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল' *(আয-যুমার, ৩৯/৩০)*। তিনি এ আয়াতটিও পাঠ করলেন, ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ 'আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনও আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন' *(আলে ইমরান, ৩/১৪৪)*। এরপর লোকজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন'।[৫] অন্য বর্ণনায় আছে, উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছিলেন, 'কেউ যদি রাসূল ﷺ মারা গেছে— এমন কথা বলে, তাহলে আমি আমার এই তরবারী দ্বারা তাকে আঘাত করব'। ...উপস্থিত জনগণ আবূ বকর পকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহচর! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মৃত্যুবরণ করেছেন? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ।[৬] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলতেন, 'নবী ﷺ আমার বুক ও থুতনির মাঝে মৃত্যুবরণ করেন'।[৭]

এরপরও আমাদের দেশের বহু মানুষ বিশ্বাস করে, রাসূল ﷺ মারা যাননি! একশ্রেণির আলেম 'হায়াতুন নবী'কে প্রমোট করার প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন, বাহাছ-মুনাযারা করছেন! দুঃখ রাখি কোথায়! যাহোক, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী আলেম ও জনগণের প্রায় সবাই হানাফী হওয়ার কারণে মানুষ এটাকে 'হানাফী আক্বীদা' বা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা বলে মনে করে। অথচ এটা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। উপর্যুক্ত অকাট্য দলীল-প্রমাণ রেখে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ঐসব ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী হবেন— সেকথা কি ভাবা যায়?!

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ, অন্য নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম ও শহীদগণের বারযাখী জীবনে জীবিত থাকার কথা কুরআন-হাদীছ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তবে, মনে রাখতে হবে, এ জীবন মাটির নিচের জীবন; মাটির উপরের জীবন নয়। ঐ জীবনের প্রকৃতি ও ধরন আমরা জানি না। তাহলে বারযাখী জীবনকে ইহকালীন জীবনের সাথে তুলনা করে বিভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করা ও কার্যকলাপ করা নেহায়েত বোকামি নয় কি?

(চলবে)

---

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৬৭ ও ৩৬৬৮।
৬. নাসাঈ, সুনানে কুবরা, হা/৭০৮১, 'ছহীহ'।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪৬।

www.al-itisam.com

সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*

(পর্ব-২)

হে ক্ষমতাধরগণ! যারা অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট করছ, তাদেরকে লাঞ্ছিত করছ, অপমানিত করছ, সমপত্তির জবরদখল করছ, যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত আছ, জুয়া ও মদপানে মত্ত আছ, মাজারপূজা ও ব্যবসায় বিভোর আছ- একবার চিন্তা করো ফেরাউন ও কারুনের কথা, তোমার বর্তমান অবস্থা তুলনা করো তাদের সাথে। যদি সত্যি এটি করতে পার, তবে আশা করা যায় হুঁশ ফিরে আসবে।

হে অহংকারী! আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারী, নাস্তিক, কিয়ামতে অবিশ্বাসী! মৃত্যু একদিন আসবেই। সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ - قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ - وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ‘তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এ (কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? হে নবী! আপনি বলুন, তোমাদের জন্য একটি (নির্ধারিত) দিনের ওয়াদা রয়েছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত হতে পারবে না এবং এক মুহূর্তও এগিয়ে আসতে পারবে না। কাফেররা বলে, আমরা কখনোও এ কুরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাপিষ্ঠদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। অহংকারীরা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট হেদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, (প্রকৃতপক্ষে) তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করি। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুত আমি কাফেরদের গলায় বেড়ী পরাবো। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত’ *(সাবা, ৩৪/২৯-৩৩)*।

হে কবরপূজারি! যারা মাজারব্যাবসা করে অবৈধ সম্পদ দিয়ে আপন পেট ভর্তি করছ, মানুষের ঈমান লুণ্ঠন করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করছ। মৃত্যু, কবরের শাস্তি, হাশরের ময়দানের বিচার ইত্যাদির কথা বারবার চিন্তা করো। হে মুরিদান! যারা মনে কর পীর না ধরলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। সেই দিন তোমাদের পীর কোথায় যাবে? তাদের আর তোমাদের কী অবস্থা হবে? একবার ভেবে দেখো। হে আল্লাহকে অস্বীকারকারী নাস্তিকদের দল! মৃত্যুর ভয়াবহতা এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে একবার ভেবে দেখ। তোমাদের ভয় হয় না? সেই দিন প্রতেক মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য চিত্র প্রকাশ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا - وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا - وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا - يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا - بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا - يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ‘পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে। যখন সে তার অভ্যন্তরের বোঝাসমূহ বের করে দিবে। এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পারে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে’ *(যিলযাল, ৯৯/১-৮)*।

হে নেতৃবর্গ! স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের সকল ক্ষমতা বিনাশ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ - وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ - يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ - مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ -

* এম. এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ - ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ - ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ - إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ - وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ - فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ - وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ - لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ ‘যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো উপকারে আসলো না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, একে ধরো, তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। অতঃপর তাকে ৭০ গজ দীর্ঘ এক শিকলে শৃঙ্খলিত করো। কেননা সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না। অতএব, আজ এখানে তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই। এবং ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত কোনো খাদ্য নাই আর অপরাধী ব্যতীত কেউ এটা ভক্ষণ করবে না’ *(আল-হাক্কা, ৬৯/২৫-৩৭)*।

হে মানবজাতি! পরকালে কেউ কারো উপকার করতে পারবে না, বিধায় অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করো। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا - يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ - وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ - وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ - كَلَّا إِنَّهَا لَظَى - نَزَّاعَةً لِلشَّوَى - تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى - وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ ‘আর (সে দিন) কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুর খবর নেবে না। যদিও তারা একে অপরেকে দেখতে পাবে। সে দিন গোনাহগার ব্যক্তি আযাবের মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। আর পৃথিবীর সবকিছুকে দিতে চাইবে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে রক্ষা করে। কখনোই নয়, নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে। জাহান্নাম ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল। সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছিল অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল’ *(আল-মাআরিজ, ৭০/১০-১৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ - وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ -ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ - وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ ‘অতঃপর যেদিন কর্ণ বিদারক বিকট ধ্বনি আসবে। সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল। এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধুলায় ধূসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল’ *(আবাসা, ৮০/৩৩-৪২)*।

ইচ্ছামতো চললে পরকালে কল্যাণ পাওয়া যাবে না। প্রবৃত্তির অনুসারী যারা হবে, জাহান্নাম হবে তাদের বাসস্থান। কারণ জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি আর লোভ-লালসা দ্বারা ঘেরা। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ‘দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ঘেরা জান্নাত আর জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসা দ্বারা ঘেরা’।[১] স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, অহংকারী ও কু-প্রবৃত্তির আনুসারীদের জন্যই জাহান্নাম তৈরি করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ ‘জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হলো। জান্নাত বলল, ফক্বীর, মিসকীন ও দুর্বল ব্যক্তিরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জাহান্নাম বলল, স্বৈরাচারী, ক্ষমতাধর ও অহংকারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব, আমি তোমার দ্বারা যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তিনি জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত, আমি তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা দয়া করব’।[২] আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ ‘কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম হতে একটি গর্দান (মাথা) বের হবে। এর দুইটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে, দুটি কান থাকবে, যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে, তিন ধরনের লোকের জন্য আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে— (১) প্রতিটি অবাধ্য অহংকারী যালিমের জন্য, (২) আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কিছুকে যে ব্যক্তি ইলাহ বলে ডাকে, তার জন্য এবং (৩) ছবি নির্মাতার জন্য’।[৩]

(চলবে)

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮২২; সুনানে তিরমিযী, হা/২৫৫৯।
২. সুনানে তিরমিযী, হা/২৫৬১, সনদ হাসান।
৩. সুনানে তিরমিযী, হা/২৫৭৪, ছহীহ।

লোক দেখানো আমলের পরিণতি

-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*

ভূমিকা :

আরবী اَلرِّيَاءُ শব্দটি اَلرُّؤْيَة শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। اَلرِّيَاءُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে— প্রদর্শন, আত্মপ্রদর্শন, ভান, কপটতা, মুনাফেক্বী, ভণ্ডামি প্রভৃতি।[১] আর اَلسُّمْعَةُ শব্দের অর্থ হচ্ছে— খ্যাতি, সুখ্যাতি, সুনাম ইত্যাদি।[২] মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করাকে রিয়া বলা হয়। যাতে করে লোকেরা ইবাদতকারী ব্যক্তির প্রশংসা করে। اَلرِّيَاءُ এবং اَلسُّمْعَةُ এর মধ্যে পার্থক্য হলো— মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যে আমল করা হয় তথা যা চোখ দিয়ে দেখা যায়, তাকে اَلرِّيَاءُ বলা হয়। যেমন— ছালাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি। আর যে আমল মানুষকে শুনানোর উদ্দেশ্যে করা হয় তথা যা কানে শুনা যায়, তাকে اَلسُّمْعَةُ বলা হয়। যেমন— কুরআন তেলাওয়াত করা, ওয়ায করা, যিকির-আযকার করা ইত্যাদি। যেসব আমল মানুষ তাদের কথাবার্তায় উল্লেখ করে এবং অন্যকে জানায়, তাও اَلسُّمْعَةُ এর মধ্যে গণ্য।

লৌকিকতা বা লোক দেখানোর জন্য আমল করার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। লোক দেখানোর জন্য যে আমল করা হয় ইসলামে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, যা শিরকে আছগার বা ছোট শিরক নামে পরিচিত। আর শিরক বলতেই অমার্জনীয় অপরাধ বোঝায়, যা মানুষের সকল নেক আমলকে নষ্ট করে দিতে পারে। কারণ, ইবাদত-বন্দেগী হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হলে তা নিষ্ফল বলে গণ্য হবে। ঐ ইবাদত কোনোই কাজে আসবে না। তাই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে যে কোনো ধরনের আমল করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ ‘বিশুদ্ধচিত্ত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ব্যতীত তাদেরকে আর কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি’ *(আল-বাইয়িনা, ৯৮/৫)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ‘নিশ্চয় মুনাফিক্ব (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুত তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে’ *(আন-নিসা, ৪/১৪২)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা যেমন এক, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মা‘বূদ নেই। ঠিক তেমনি ইবাদত একমাত্র তাঁর জন্যই হওয়া চাই। তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনিই যেহেতু একমাত্র মা‘বূদ, সুতরাং ইবাদত একমাত্র তাঁরই করা উচিত। বিধায় যে আমল রিয়া বা লোক দেখানো চেতনামুক্ত এবং যা সুন্নাত মোতাবেক হয়, তাকেই কেবল সৎ আমল হিসেবে গণ্য করা হয়’।[৩]

একজন মুসলিমের প্রতিটি ইবাদত আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হবে। তাতে বিন্দুমাত্র অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। দুনিয়া হাছিল কিংবা কারো সুদৃষ্টি লাভের আশায় করার সুযোগ নেই। কাউকে দেখানোর বা শুনানোর মানসিকতা পোষণ করা বৈধ নয়। এরূপ ইচ্ছা থাকলে পরকালে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অনেক আমল করার পরও বিচারের মাঠে শূন্য হাতে উঠতে হবে। লৌকিকতা ও সুনাম অর্জনের নিমিত্তে করার অপরাধে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

লোক দেখানো আমল শিরকের অন্তর্ভুক্ত :

সাধারণত মানুষ নিজের খ্যাতি অন্যকে জানাতে পছন্দ করে। তার সুনাম ও সুখ্যাতির কথা সবাই জানুক তা সে মনে মনে চায়। অথচ মানুষকে দেখানোর জন্য বা সুনাম অর্জনের জন্য আমল করা শরীআতে নিষিদ্ধ। এরূপ আমল শিরকের সমপর্যায়ভুক্ত। এমন কর্মকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি ভয় পেতেন। তিনি এ বিষয়ে ছাহাবীদের কঠোর ভাষায় সাবধান করে গেছেন। মাহমূদ ইবনু লাবীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৩৩তম মুদ্রণ, জানুয়ারি-২০২০), পৃ. ৫৩৩।

২. আল-মু‘জামুল ওয়াফী, পৃ. ৫৮০।

৩. আল-ইরশাদু ইলা ছহীহিল ই‘তিক্বাদ ওয়ার রাদ্দি ‘আলা আহলিশ শিরকি ওয়াল ইলহাদ, পৃ. ১১২; ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, পৃ. ৩৫৭।

اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

‘তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে যে বিষয়ের বেশি ভয় পাই, তা হলো শিরকে আছগার। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! শিরকে আছগার কী? তিনি বললেন, রিয়া তথা লোক দেখানো আমল’। যখন (কিয়ামতে) লোকদের আমলসমূহের প্রতিদান প্রদান করা হবে, তখন আল্লাহ তাআলা সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, ‘তোমরা তাদের নিকটে যাও, যাদের দেখানোর জন্য দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখো, তাদের নিকট কোনো প্রতিদান পাও কি না’।[৪] লোক দেখানো আমল শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা উল্লিখিত হাদীছের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত। এরূপ ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ব্যঙ্গ করে তাদের নিকটে ফিরে যেতে বলবেন, যাদের দেখানোর জন্য সে আমল করেছিল। যা তার জন্য ভীষণ লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। এমন কাজকে গোপন শিরকও বলা হয়েছে। এ মর্মে অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন, ‘সাবধান! আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জাল হতেও আশঙ্কাজনক?’ আমরা বললাম, বলুন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি বললেন, ‘আর তা হলো ‘শিরকে খাফী’ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়িয়ে এই কারণে ছালাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে যে, তার ছালাত কোনো ব্যক্তি দেখছে’।[৫] মাহমূদ ইবনু লাবীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘নবী করীম ﷺ বের হয়ে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ قَالَ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ ‘হে লোকসকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! গোপন শিরক কী? তিনি বললেন, গোত্রের কোনো ব্যক্তি যখন ছালাত আদায় করে, তখন খুব সুন্দর করে আদায় করার চেষ্টা করে, যাতে করে মানুষ তার দিকে তাকিয়ে তাকে দেখে। আর এটিই গোপন শিরক’।[৬]

মানুষকে দেখানোর জন্য কিংবা সুনাম অর্জনের জন্য কোনো আমল করা শিরকে আছগার হিসেবে গণ্য। আবার একে কোনো কোনো হাদীছে গোপন শিরক বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির অধিক ভয় পেতেন। বিষয়টি কানা দাজ্জালের ভয়ংকর ফেতনার চেয়েও মারাত্মক। কারণ এরূপ কাজ করতে মানুষ বেশি পছন্দ করে। একে কোনো অপরাধই মনে করে না। বরং এরূপ কর্মে সে আনন্দ উপভোগ করে। আর আমল করতে গিয়ে শিরক হয়ে গেলে ফলাফল খুবই ভয়াবহ হবে।

শায়খ উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবাদত নষ্টকারী হিসেবে রিয়া দু’প্রকার। প্রথমত, যেটা মূল ইবাদতের মধ্যে হবে। এ ধরনের হলে তার আমল বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হবে। দ্বিতীয়ত, যা কোনো কারণবশত ইবাদতের মধ্যে পাওয়া যায়। এটা আবার দু’প্রকার : (ক) রিয়াটি দূর করা হবে। এতে কোনো ক্ষতি হবে না। (খ) রিয়াটি ইবাদতের সঙ্গে থাকবে। আর রিয়াটি যদি ইবাদতের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে তা আবার দু’ধরনের : (১) যে সব ইবাদতের শেষ অবস্থা শুরু অবস্থার উপর নির্ভরশীল, যেমন— ছালাত। তাহলে উক্ত ইবাদতটি বাতিল বলে গণ্য হবে। (২) ইবাদতের শেষ অবস্থা যদি শুরুর উপর নির্ভরশীল না হয় বরং স্বতন্ত্র, যেমন— ছাদাক্বা। এ ক্ষেত্রে যেটি ইখলাছের সাথে করা হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে, আর যেটি ইখলাছ ছাড়া শিরকের সাথে করা হবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৭]

৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৬৮৬; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৬৮৩১; ত্বাবারানী কাবীর, হা/৪৩০১; কানযুল উম্মাল, হা/৭৪৭৭; বুলূগুল মারাম, হা/১৪৮৪; ছহীহুল জামে‘, হা/১৫৫৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৫১; মিশকাত, হা/৫৩৩৪, সনদ ছহীহ।

৫. ইবনু মাজাহ, হা/৪২০৪; ছহীহুল জামে‘, হা/২৬০৭; কানযুল উম্মাল, হা/৭৪৬৮; ছহীহ আত-তারগীব, হা/৩০; মিশকাত, হা/৫৩৩৩, সনদ হাসান।

৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৯৩৭; বায়হাক্বী কুবরা, হা/৩৪০০; ছহীহুল জামে‘, হা/২৬০৭; ছহীহ আত-তারগীব, হা/৩১, সনদ হাসান।

৭. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-ক্বাওলুল মুফীদ ফী কিতাবিত তাওহীদ (সঊদী আরব, ১৪২৪ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।

www.al-itisam.com

আরাফার ছিয়াম কবে রাখবেন : একটি দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা

-আব্দুল বারী বিন সোলায়মান*

ভূমিকা : মুসলিম জীবনের মূল লক্ষ্যই হলো পাপ ক্ষমার মাধ্যমে পরকালে জান্নাত লাভ করা। সেই লক্ষ্য পূরণের বড় সহায়ক একটি মাধ্যম হলো আরাফার দিন। এই দিনে ছিয়াম রাখলে মহান আল্লাহ মানুষের দুই বছরের পাপ ক্ষমা করে দেন।[১] এই দিনে এত বেশি মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন, যা অন্য কোনো দিন করেন না।[২] তাই এই দিনের ছিয়াম মুসলিম জাতির কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু চন্দ্রের উদয়ের ভিন্নতায় ঠিক কোন দিনে এই ছিয়াম রাখা উচিত, তা নিয়ে রয়েছে মতের ভিন্নতা। নিম্নে এই বিষয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

ছিয়াম শুরু ও শেষ করার মূলনীতি : আরাফার ছিয়াম কবে রাখব সেই উত্তর জানার আগে আমরা ছিয়াম শুরু করা ও শেষ করার মূলনীতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» ‘তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম আরম্ভ করো এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম শেষ (ঈদ) করো। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শা‘বানের গণনা ৩০ দিন পুরা করো’।[৩]

এই হাদীছের আলোকে যে মূলনীতি দাঁড়ায় তা হলো—‘ছিয়ামের শুরু ও শেষ চাঁদের উদয়ের উপর নির্ভরশীল’। অর্থাৎ স্থানীয় চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখতে হবে এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম সমাপ্ত করতে হবে। অল্প কিছু লোক ব্যতীত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এই মূলনীতির বিষয়ে একমত।

মূলনীতির প্রয়োগ : এই মূলনীতির আলোকে রামাযানের ছিয়াম, আইয়ামে বীযের ছিয়াম, আশূরার ছিয়ামসহ সকল ছিয়াম স্থানীয় উদয়স্থলে চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই রাখা হয়। ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধু আরাফার ছিয়ামের ক্ষেত্রে। আরাফার ছিয়ামের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম দুটি মত দিয়েছেন।

প্রথম মত : হাজীগণ যেদিন আরাফার মাঠে অবস্থান করবেন, সেদিন আরাফার ছিয়াম রাখতে হবে। এর প্রমাণ হিসেবে তারা বলেছেন, আরাফার ছিয়াম সম্পর্কে যতগুলো হাদীছ এসেছে, সবগুলোতেই বলা হয়েছে, يوم عرفة (আরাফার দিন)। যেহেতু হাদীছে ‘আরাফার দিন’ বলা হয়েছে, يوم التاسع (নবম তারিখ) বলা হয়নি, বিধায় আরাফার ছিয়াম ‘তারিখ’ এর সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং ‘স্থান’ এর সাথে সম্পর্কিত। আর আরাফা হারামাইনের দেশ সঊদী আরবে অবস্থিত। তাই হজ্জ সম্পাদনকারীগণ যেদিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করবেন, সেই দিনই এই ছিয়াম পালন করতে হবে। সেটা যে দেশের যে তারিখই হোক না কেন। এই মতে পক্ষে গিয়েছে শায়খ বিন বাযের তত্ত্বাবধানে লাজনা দায়েমা,[৪] দারুল ইফতা আল-মিসরিয়্যা,[৫] প্রফেসর ড. হুসামুদ্দীন[৬] ও শায়খ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মাজেদ।[৭]

দ্বিতীয় মত : উপরে বর্ণিত হাদীছের আলোকে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতার ভিত্তিতে নিজ নিজ দেশের নয় তারিখে ছিয়াম রাখতে হবে। আর এই মূলনীতি ফরয ছিয়াম, আইয়ামে বীযের ছিয়াম, আশূরার ছিয়াম, আরাফার ছিয়ামসহ সকল ছিয়ামের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এই মতের দিকে গিয়েছে মারকাযুল ফাতাওয়া,[৮] ইসলাম সওয়াল ওয়া জওয়াব,[৯] ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফাতওয়া অ্যান্ড রিসার্চ,[১০] আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু উছায়মীন,[১১] শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু জিবরীন,[১২] ড. হানী ইবনু আব্দুল্লাহ আল জুবায়র,[১৩] প্রফেসর ড. আহমাদ আল-হাজ্জী আল-কুরদী[১৪] ও প্রফেসর ড. খালিদ আল-মুশায়কীহ।[১৫]

---

* দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা; শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৫৭০।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৮; মিশকাত, হা/২৫৯৪।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮১।
৪. লাজনা দায়েমা, ১০/৪০৫২।
৫. www.dar-alifta.org ফতওয়া নং ৩৪৭১।
৬. ফাতাওয়া ইয়াসআলূনাক, ১০/৩৪৮।
৭. দেখুন : শায়খ সুলায়মান আব্দুল্লাহ আল-মাজেদ এর ওয়েব সাইট, ফতওয়া নং ১৭১৬৫।
৮. মারকাযুল ফাতাওয়া (islamweb.net), ফতওয়া নং ১০৩৩৫।
৯. ইসলাম সওয়াল ওয়া জওয়াব (islamqa.info), ফতওয়া নং ৪০৭২০।
১০. আল-ক্বারারাত ওয়াল ফাতাওয়া, পৃ. ৮২-৮৩।
১১. মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, ২০/৪৭।
১২. ইবনু জাবরীনের ওয়েব সাইটে দেখুন (http://ibn-jebreen.com)।
১৩. দেখুন, «النور الساطع من أفق الطوالع» পৃষ্ঠা নং ০৭।
১৪. شبكة الفتاوى الشرعية (http://www.islamic-fatwa.com), ফতওয়া নং ৩৩৯৬৯।
১৫. موقع المسلم (http://almoslim.net/55164)।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, অঞ্চলের ভিন্নতায় চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার কারণে আরাফার দিন ভিন্ন ভিন্ন হলে আমরা কি স্থানীয় চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখব, না হারামাইনের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ছিয়াম রাখব?

তিনি উত্তরে বলেছেন, সঠিক কথা হলো— উদয়স্থলের ভিন্নতায় ছিয়াম ভিন্ন ভিন্ন দিনে হবে। ইবনু তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ ও এই মত গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যদি মক্কায় চাঁদ দেখা যায়, তাহলে এই দিনটি মক্কার নবম তারিখ। কিন্তু কোনো দেশে যদি মক্কার পূর্বে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে মক্কার নবম তারিখ হবে তাদের ঈদের দিন। এই দিনে ছিয়াম রাখা তাদের জন্য জায়েয হবে না। কেননা তা তাদের ঈদের দিন। আবার কোনো দেশে যদি মক্কার পরে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে মক্কার নবম তারিখ হবে তাদের অষ্টম তারিখ। তাই তারা নিজেরদের নবম তারিখে ছিয়াম রাখবে, যেটা মক্কার দশম তারিখ। এটাই অগ্রগণ্য মত। কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন ছিয়াম রাখো। আবার যখন চাঁদ দেখেবে তখন ছিয়াম শেষ করো'। দৈনিক সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন তারা স্থানীয় সময় হিসাব করে, তদ্রূপ মাসিক সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সময় হিসাব করবে'।[১৬]

পর্যালোচনা :

১. দ্বিতীয় পক্ষ যে হাদীছটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তা সর্বজন স্বীকৃত একটি মূলনীতি। এই মূলনীতি সকল ছিয়ামের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। যদি কেউ নির্দিষ্ট কোনো ছিয়ামকে এই মূলনীতি থেকে পৃথক করতে চান তাহলে তার জন্য সুস্পষ্ট দলীল উপস্থাপন করা অপরিহার্য। অথচ এর পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলীল নেই।

২. হাদীছে يوم التاسع বা নয় তারিখ বলা হয়নি একথা ঠিক, তবে হজ্জের কার্যাবলির ধারাবাহিক বিবরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আরাফা নয় তারিখেই হয়ে থাকে। সালাফে সালেহীনগণও এ কথাই বলেছেন।

ইমাম ইবনু কুদামা বলেন, আরাফার দিন হলো যুলহিজ্জা মাসের নবম তারিখ।[১৭] শামসুদ্দীন আল-খতীব বলেন, আরাফার ছিয়াম যুলহিজ্জার নবম তারিখে, হাজীগণ ছাড়া অন্যরা রাখবে।[১৮] এছাড়াও ইমাম শামসুদ্দীন রামলী, শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনছারীসহ বহু বিদ্বান বলেছেন, আরাফার দিন হলো নয় তারিখ।

৩. প্রথম পক্ষ বলেছেন, আরাফা হলো স্থানের নাম। অতএব হাজীগণ যেদিন আরাফার মাঠে অবস্থান করবেন, সেই দিনেই আরাফার ছিয়াম পালন করতে হবে। কিন্তু عرفة সময়ের নাম, না-কি স্থানের নাম— এই নিয়েও মতভেদ রয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

«قوله : من عرفة : على وزن فعلة اسم للزمان، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا هو الصحيح، وقيل: عرفة وعرفات كلاهما اسمان للمكان المخصوص»

عرفة শব্দটি فعلة এর ওযনে এসেছে, যা একটি সময়ের নাম। তা হলো জুলহিজ্জা মাসের নবম তারিখ। আর এই মতটিই বিশুদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, عرفة ও عرفات দুটিই নির্দিষ্ট স্থানের নাম।[১৯] এছাড়াও আল্লামা শামসুদ্দীন কিরমানী عرفة দ্বারা উদ্দেশ্য সময় না স্থান, এর মধ্যে সময়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[২০] **[উল্লেখ্য যে,** 'আরাফা স্থানের নাম' এই মতটি আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। -আল্লাহই ভালো জানেন]।

৪. তাদের বক্তব্যের প্রমাণে যা পেশ করেছেন তা কোনো সুস্পষ্ট দলীল নয়। বরং তা যুক্তিমাত্র। প্রশ্ন হতে পারে, হাদীছে উল্লিখিত يوم عرفة (আরাফার দিন) শব্দটি কি সুস্পষ্ট দলীল নয়? উত্তর : জি না, এটা সুস্পষ্ট দলীল নয়। কারণ 'আরাফার দিন' বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানকে নির্দিষ্ট করেননি। বরং তিনি উক্ত ছিয়াম পালনের সময়টার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর সেটা হলো নয় তারিখ, যেদিন হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থান করেন।

৫. যদি কেউ বলে 'আরাফার দিন' বলে নবম তারিখকে বুঝানো হয়নি, বরং আরাফার মাঠে অবস্থান করাকে বুঝানো হয়েছে, তাহলে তাদের কাছে প্রশ্ন, আরাফার দিনটা তাহলে কবে হবে? উত্তর হবে : যেদিন হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থান করেন। আবার প্রশ্ন করুন, হাজীগণ কবে আরাফার মাঠে অবস্থান করেন? উত্তর হবে : আরাফার দিনে। তাহলে কি তাদের মতানুসারে আরাফার মাঠে অবস্থানের নির্ধারিত কোনো তারিখ নেই? হাজীগণ নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে যেকোনো দিনে আরাফার মাঠে অবস্থান করলেই তা আরাফার দিন বলে গণ্য হয়ে যাবে? হাজীগণ যদি সাত কিংবা আট তারিখে আরাফার মাঠে অবস্থান করেন, তাহলে কি সেটা আরাফার দিন বলে গণ্য

১৬. ইসলাম সওয়াল ওয়া জওয়াব (islamqa.info), ফতওয়া নং ৪০৭২০।
১৭. আল-মুগনী, ৪/৪৪৩।
১৮. মুগনিল মুহতাজ, ২/১৮২।
১৯. উমদাতুল কারী, ২/২৫৯।
২০. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

www.al-itisam.com

হবে? অবশ্যই না। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, يوم عرفة বা 'আরাফার দিন' বলতে নির্ধারিত তারিখকে বুঝানো হয়েছে। নির্ধারিত স্থানকে নয়।

৬. তাছাড়া কোনো ঘটনা বা বিধান কোনো স্থানে ঘটলেই সেটা স্থানের সাথে খাছ হয়ে যায় না। যেমন ফেরাঊন মূসা আলাইহিস সালাম - কে ধাওয়া করতে গিয়ে লোহিত সাগরে বা বাহরে কুলযুমে ডুবে মারা গিয়েছিল। ফেরাঊনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার শুকরিয়াস্বরূপ মূসা আলাইহিস সালাম মুহাররমের ১০ তারিখ ছিয়াম রেখেছিলেন।[২১] সেই ঘটনাটা তো একটি স্থানে ঘটেছিল এবং সেটা সেই দেশের ১০ তারিখে ঘটেছিল। তাহলে আমরা কেন ছিয়ামটি আমাদের দেশের ১০ তারিখে রাখি? এতে তো সেই দেশের ১০ তারিখ এবং আমাদের ১০ তারিখ ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে? স্থানীয় ১০ তারিখে রাখার কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো।[২২]

৭. তারা বলেছেন, নিজ নিজ অঞ্চলের উদিত চাঁদের ভিত্তিতে আরাফার ছিয়াম রাখা হলে আরাফা কি তাহলে দুইদিন হবে? এই প্রশ্ন অযৌক্তিক। কারণ রামাযানের ছিয়াম, আশূরার ছিয়াম, লায়লাতুল ক্বদর ইত্যাদি আমরা ভিন্ন ভিন্ন দিনে পালন করি। তাহলে কি লায়লাতুল ক্বদর ও আশূরা একদিনে হবে, না দুই দিনে হবে? এছাড়া রাতের শেষ-তৃতীয়াংশে আল্লাহর সপ্তম আসমানে নেমে আসার বিষয়টি[২৩] যুক্তি দিয়ে কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অতএব, উক্ত প্রশ্ন সঙ্গত নয়।

সঊদীর সাথে আরাফা পালন করলে যে সকল সমস্যা হবে :

১. চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখা ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ার হাদীছ লঙ্ঘিত হবে।

২. সঊদী আরবের পশ্চিমের দেশগুলোতে যখন একদিন আগে চাঁদ দেখা যাবে, (২০২১ সালের ঈদুল ফিতরেই যা ঘটেছে।[২৪]) তখন সঊদী আরবের নয় তারিখের দিন তাদের হবে ১০ তারিখ। অর্থাৎ কুরবানীর দিনে তাদের আরাফার ছিয়াম রাখতে হবে। অথচ কুরবানীর দিনে ছিয়াম রাখা হারাম।[২৫] তাহলে কি তারা এই ছিয়ামের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে? একই দিনে ঈদ পালন করা যে বাস্তবতা বিরোধী, তা এবার চাঁদপুরের মানুষের ঈদ উদযাপনের দুঃখজনক ঘটনায় আরও একবার প্রমাণিত হলো। চাঁদপুরের সাদ্রা দরবার থেকে ভোর রাতে ঈদ পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু এই ঘোষণা সবার কাছে না পৌঁছায় একই দিনে ঈদ পালনের অনুসারী হয়েও অনেকে সেদিন ঈদ পালন করতে পারেনি।[২৬]

৩. আরাফার ছিয়াম রাখতে হয় ঈদের আগের দিনে। কিন্তু সঊদীর সাথে মিল রেখে আরাফা পালন করা হলে পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের আরাফার ছিয়াম ঈদের দুই দিন আগে রাখতে হবে, যা ছহীহ সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৪. যুলহিজ্জার চাঁদ উঠার পর থেকেই তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। এটাকে বলা হয় 'মুতলাক্ব তাকবীর'।[২৭] আর আরাফার দিন ফজর থেকে অর্থাৎ ছিয়ামের সাথে সাথে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ তারিখ) আছরের ছালাতের পর পর্যন্ত মোট পাঁচ দিন প্রতি ফরয ছালাতের পরে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। এর নাম 'মুকায়্যাদ তাকবীর'।[২৮] কিন্তু সঊদীর সাথে আরাফা পালন করলে পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর জন্য মুকায়্যাদ তাকবীরের সময়সীমা হবে ছয় দিন। এক্ষেত্রে কি তারা সামঞ্জস্য বজায় রাখায় নিমিত্তে ৮ তারিখে ছিয়াম রাখবে এবং ৯ তারিখ থেকে তাকবীর পাঠ শুরু করবে, না ছিয়াম তাকবীর একই দিনে শুরু করা উচিত?

৫. প্রযুক্তির কল্যাণে এখন আমরা আরাফার ময়দানে হাজীগণের অবস্থান করাটা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু প্রযুক্তি আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে এটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তখন পূর্বাঞ্চলীয় দেশের লোকজন কীসের ভিত্তিতে আরাফার ছিয়াম পালন করত? তারা কি 'আরব দেশে সাধারণত একদিন আগে চাঁদ উঠে' এই নীতির ভিত্তিতে নিজ দেশে চাঁদ না দেখেই অনুমান করে একদিন আগে আরাফার ছিয়াম রাখত, না নিজ দেশে উদিত চাঁদের তারিখের ওপর ভিত্তি করে ছিয়াম রাখত? তাছাড়া কিয়ামতের পূর্বে প্রযুক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনটা বিভিন্ন হাদীছ থেকে বুঝা যায়।[২৯] যখন প্রযুক্তি থাকবে না তখন

---

২১. ইবনু মাজাহ, হা/১৭৩৪; ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪২।

২২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮১।

২৩. ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৮; মিশকাত, হা/১২২৩।

২৪. ২০২১ সালের ঈদুল ফিতরের চাঁদ মে মাসের ১২ তারিখে সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তানসহ সাতটি দেশে চাঁদ দেখার সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের চাঁদপুরে ৫০ গ্রাম ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছেন। সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৩ মে ২০২১; The Daily Star; বাংলা ট্রিবিউনসহ আরও অনেক সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রচারিত হয়েছে।

২৫. আবূ দাঊদ, হা/২৪১৬; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২২।

২৬. সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন, ১৩ মে ২০২১।

২৭. সূরা আল-হজ্জ, ২২/২৮; সূরা আল-বাক্বারা, ২/২০৩; ছহীহ বুখারী, অধ্যায় 'আইয়্যামে তাশরীকে আমল করার ফযীলত'; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪১।

২৮. আশ-শারহুল মুমতে', ৫/২২০-২২৪; মাজমূ'উল ফাতাওয়া বিন বায, ১৩/১৭।

২৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৯৯, ২৯৩৭; মিশকাত, হা/৫৪২২, ৫৪৭৫।

পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের লোকেরা অনুমাননির্ভর আরাফার ছিয়াম রাখবে, না নিজ দেশের চাঁদের তারিখ অনুযায়ী রাখবে?

(৬) এর মাধ্যমে তারা নিজেরাই স্ববিরোধিতায় অবতীর্ণ হচ্ছেন :

(ক) হাদীছভিত্তিক মূলনীতিকে লঙ্ঘন করে তারা আরাফার দিন ছিয়াম রাখার কথা বলছেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রে তারা সেই নীতি থেকে বের হয়ে তাদেরকে নিজ দেশের নয় তারিখে ছিয়াম রাখার কথা বলছেন। কারণ তারা হারামাইনের সাথে আরাফার ছিয়াম পালন করতে গেলে ঈদের দিনে ছিয়াম রাখতে বাধ্য হবে। অথচ তা সম্পূর্ণরূপে হারাম।[৩০]

(খ) প্রযুক্তি ধ্বংস হলে পুনরায় তারা নিজ মত থেকে ফিরে হাদীছভিত্তিক মূলনীতির দিকে ফিরে আসতে বাধ্য হবেন।

সর্বোপরি এই ফতওয়া সার্বজনীন নয়। বরং কিছু দেশের জন্য প্রযোজ্য, অন্য কিছু দেশের জন্য নয়; কিছু সময়ের জন্য প্রযোজ্য, অন্য সময়ের জন্য নয়।

আর ইসলামের বিধান নির্দিষ্ট সময় কিংবা দেশের সাথে নির্দিষ্ট হতে পারে না। বরং তা সকল দেশ ও সকল সময়ের জন্য যথোপযুক্ত। তাই শুধু একটি শব্দের (عرفة) মাধ্যমে ইসতিদলাল করতে গিয়ে ফতওয়াকে সংকীর্ণ না করে দিয়ে সার্বজনীন ফতওয়ার প্রতি আমল করা উচিত। -(ওয়াল্লাহু আ'লাম)।

পুনশ্চ : সঊদী আরবের সাথে মিল রেখে আরাফার ছিয়াম পালন করার পক্ষে কয়েকজন বিদ্বান ফতওয়া দিয়েছেন। বিধায় যদি কেউ আট তারিখে ছিয়াম রাখা ভালো মনে করেন, তাহলে রাখতে পারেন। তবে নিজ নিজ অঞ্চলের চাঁদের তারিখ অনুযায়ী নয় তারিখে ছিয়াম রাখাটাই দলীলের সবচেয়ে নিকটবর্তী মত বলে মনে হয়। -(ওয়াল্লাহু আ'লাম)।

৩০. আবূ দাঊদ, হা/২৪১৬; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২২।

'দারসে হাদীছ'-এর বাকী অংশ

যেসব প্রশ্ন নবী-রাসূলদের আলাইহিমুস সালাম বিব্রত করার জন্য করা হতো, তার ধরন নবীভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাদের প্রশ্ন ছিল নবীদের আলাইহিমুস সালাম উপর কঠোরতা আরোপের উদ্দেশ্য। নবীদের আলাইহিমুস সালাম উপর তাদের মতভেদ তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল। এর উত্তম উদাহরণ হলো যা মূসা আলাইহিস সালাম-এর যামানায় ঘটেছিল। যখন তাদেরকে একটি গরু যবেহ করার জন্য আদেশ করা হলো, তখন গরুর বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে তারা সীমালঙ্ঘন করল। আর এ বিষয়টি তারা নিজেরা নিজেদের উপর চাপিয়ে নিয়েছিল। যে কোনো গরু যবেহ করার অনুমোদন তাদের জন্য ছিল। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কঠিন করে দিয়েছিলেন। যখন তারা তাদের নবী আলাইহিস সালাম-এর উপর মতভেদ করল, তখন তাদের নিজেদের হত্যার দু'আ ব্যতীত অন্য কোনো দু'আ কবুল করা হলো না। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তীহ প্রান্তরে ৪০ বছর উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘোরার শাস্তি দিলেন। এ জাতীয় কাজের পরিণাম এমনই হয়ে থাকে।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীছ। একজন আদর্শ প্রশ্নকর্তার নৈতিকতা, বৈশিষ্ট্য, কথা বলার ধরন কেমন হবে, তা এই হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তার মধ্যে কী মাত্রার সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আন্তরিকতা থাকতে হবে, তাও আলোচিত হয়েছে এখানে। আদিষ্ট বিষয়ের আলোকে জীবনযাপন এবং নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালানোর আদেশ করা হয়েছে এই হাদীছে। চরম সত্যবাদিতা, চরম ন্যায়পরায়ণতা, চরম একনিষ্ঠতা এবং কঠিন আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি গুণ অর্জনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে এখানে। ইবাদত পালনের সময়ের সততা, একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা যেন নির্জনতায় ও পারিবারিক আনন্দঘন মুহূর্তেও বজায় থাকে, সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে। হাদীছটির শিক্ষা এবং এই গুণগুলোর আলোকে আমরা যেন আমাদের জীবন গঠন করতে পারি, সেই তাওফীক্ব আল্লাহ আমাদের দান করুন-আমীন! ছুম্মা আমীন!!

একটি লিফলেটের ইলমী জবাব

-আহমাদুল্লাহ*

(পর্ব-২)

(৪) ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা না পড়া :

এ শিরোনামে মুফতী সাহেব একটি ছহীহ হাদীছ পেশ করেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপ :

عن ابى هريرة رضـ عن النبى ﷺ قال: جعل الامام ليوتم به فاذا قرأ فانصتوا. (السنن للنسائى رقم الحديث 922 ، السن لابى داود رقم الحديث 604) وفى رواية واذا اقرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا اٰمين. (الصحيح المسلم، رقم الحديث : 404)

অর্থ : আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, ‘নবীজী সা. ইরশাদ করেন, ইমামকে এজন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন তাকে অনুসরণ করা হয়। অতএব, তিনি যখন তেলাওয়াত করবেন, তোমরা নিরবে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো’।

অন্য বর্ণনায় আছে, ‘যখন ইমাম তেলাওয়াত করবেন, তখন তোমরা নিরবে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো এবং ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين তেলাওয়াত করবেন, তখন তোমরা اٰمين বলো’। (মুছলিম-১/১৭৪, নাছায়ী-১/১৪৬)

জবাব : প্রথমত, হাদীছটি যঈফ বা দুর্বল, যা উক্ত হাদীছের সংকলক ইমাম আবূ দাঊদ নিজেই বলে গিয়েছেন। কিন্তু লেখক নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন মানসিকতার দরুন ইমাম আবূ দাঊদের উক্তিটুকু গায়েব করে ফেলেছেন। পূর্ণ হাদীছটি নিম্নরূপ :[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ « وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا». لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهَمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য’। এই হাদীছের শেষে বৃদ্ধি করেছেন, ‘আর ইমাম তেলাওয়ার করলে চুপ থাকো’। ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, ‘আর ইমাম তেলাওয়ার করলে চুপ থাকো’ অংশটুকু মাহফূয নয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে মূলত আবূ খালেদের থেকে ওহম (সংশয়) সৃষ্টি হয়েছে।[২]

অবশ্য হাদীছটিকে ইমাম আলবানী হাসান ও ছহীহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ বহুপূর্বে বলেছেন ‘হাদীছটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইজমা হয়নি’। তিনি বলেন, ‘হাদীছটি আমার মতে ছহীহ হলেও ছহীহ মুসলিমে সেটিকে স্থান দেইনি, কারণ আমি ইজমা না থাকলে কোনো হাদীছ আমি স্থান দেই না।[৩]

দ্বিতীয়ত, হাদীছটিতে বলা হয়েছে, ইমামের তেলাওয়াত চলাকালীন চুপ করে তেলাওয়াত শ্রবণ করতে হবে। অথচ হানাফীরা তা করেন না। তারা এ সময়ে ছানা পাঠ করাকে বৈধ মনে করেন। কোন দলীলের ভিত্তিতে তারা নীরব না থেকে ছানা পাঠ করেন?

তৃতীয়ত, হাদীছটি আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। যার কারণে হাদীছটিকে সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক খাছ হাদীছ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি কোনো খাছ হাদীছ পাওয়া যায়, তাহলে খাছ হাদীছের উপর আমল করতে হবে।[৪] আর খাছ হাদীছে পৃথকভাবে সূরা ফাতিহা পড়াকে আবশ্যক করা হয়েছে। উবাদা ইবনুছ ছমেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ‘তার কোনো ছালাত নেই, যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না’।[৫]

চতুর্থত, ইমামের তেলাওয়াত অবশ্যই মুক্তাদীকে শ্রবণ করতে হবে। তবে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্যান্য সূরা শ্রবণ করার কথা বলা হয়েছে। মুক্তাদীকে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ নিম্নরূপ :

(১) উবাদা ইবনুছ ছমেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ‘তার কোনো ছালাত নেই, যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না’।[৬]

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. নাসাঈ, হা/৯২২।

২. আবূ দাঊদ, হা/৬০৪।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৪।

৪. উসূলুশ শাশী; নূরুল আনওয়ার।

৫. জুযউল ক্বিরাআত, হা/২; ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬।

৬. জুযউল ক্বিরাআত, হা/২; ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬।

(২) আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ ‘যে ব্যক্তি ছালাত পড়ল, কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, সেই ছালাত ত্রুটিযুক্ত (বাতিল)। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি কথাটি তিন বার বললেন। অর্থাৎ তা পরিপূর্ণ নয়।[৭]

(৩) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ‘প্রত্যেক ঐ ছালাত যেখানে উম্মুল কিতাব পাঠ করা হয় না, তা ত্রুটিযুক্ত’।[৮]

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে রেওয়ায়াত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ‘প্রত্যেক ঐ ছালাত যেখানে উম্মুল কিতাব পাঠ করা হয় না, তা ত্রুটিযুক্ত’।[৯]

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ‘তার কোনো ছালাত নেই, যে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে না’।[১০]

(১০) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণনা আছে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুক্তাদীদেরকে) বলেছেন, فَلاَ تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ ‘তোমরা এমন করবে না; তোমাদের প্রত্যেকে মনে মনে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করবে’।[১১]

(১১) একজন ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুক্তাদীদেরকে) বলেছেন, فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ ‘তোমরা এমন করবে না, তবে তোমাদের প্রত্যেকে মনে মনে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করবে’।[১২]

(১২) নাফে‘ ইবনু মাহমূদ রাহিমাহুল্লাহ (তাবেঈ) উবাদা ইবনুছ ছমেত (ছাহাবী) রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুক্তাদীদেরকে) বলেছেন, فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ‘তোমরা এমন করবে না, তবে উম্মুল কুরআন ব্যতীত। কেননা যে এটা পাঠ করবে না, তার কোনো ছালাত নেই’।[১৩] একটি সনদে এই শব্দগুলো আছে- لاَ يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ‘যখন আমি উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করি, তখন তোমাদের মধ্য হতে একজনও সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু যেন পাঠ না করে’।[১৪]

(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে রেওয়ায়াত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুক্তাদীদেরকে) বলেছেন,فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ‘উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতিহা ব্যতীত কিছু পড়বে না’।[১৫]

(১৪) ‘মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব মাকহূল হতে, তিনি মাহমূদ ইবনু রবী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে, তিনি উবাদা ইবনুছ ছমেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু’-এর সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদীদেরকে বলেছেন, فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ‘উম্মুল কুরআন ব্যতীত ক্বিরাআত পাঠ করবে না; নিশ্চিতরূপে তার ছালাত হয় না, যে তা (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে না’।[১৬]

(১৮) রিফাআ ইবনু রাফে‘ আয-যুরাকী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ثُمَّ ارْكَعْ ‘যখন ছালাতের ইক্বামত প্রদান করা হয়, তখন তাকবীর দাও। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ এবং যা সহজ হয় তা পাঠ করো। তারপর রুকূ করো’।[১৭]

(১৯) উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পর্কে বলেছেন, ‘হ্যাঁ (পাঠ করো)... যদিও আমি পাঠ করতে থাকি’।[১৮]

(২০) আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পর্কে বলেছেন, اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ‘তুমি এটি তোমার অন্তরে পাঠ করবে’।[১৯] আরও বলেছেন, إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبِقْهُ ‘যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, তখন তুমিও পাঠ করো। আর ইমামের পূর্বেই তা শেষ করবে’।[২০] একটি রেওয়ায়াতে এসেছে যে, প্রশ্নকর্তা বলেছিলেন, যখন ইমাম জেহরী ক্বিরাআত করেন, তখন

---

৭. জুযউল ক্বিরাআত, হা/১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৫।
৮. সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/৮৪০, আহমাদ, হা/২৬৮৮৮।
৯. জুযউল ক্বিরাআত, হা/১৪; ইবনু মাজাহ, হা/৮৪১।
১০. বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত, হা/১০০, পৃ. ৫০, সনদ ছহীহ।
১১. জুযউল ক্বিরাআত, হা/২৫৫; ইবনু হিব্বান, হা/৪৫৮, ৪৫৯; আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ, পৃ. ১৯, ‘ছহীহ’।
১২. জুযউল ক্বিরাআত, হা/৬৭; আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ, পৃ. ২৯, ‘ছহীহ’।
১৩. বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত, হা/১২১, পৃ. ৬৪, সনদ হাসান, বায়হাক্বী ছহীহ বলেছেন।
১৪. সুনানে নাসাঈ, হা/৯২১; জুযউল ক্বিরাআত, হা/৬৫; আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ, পৃ. ২৯।
১৫. জুযউল ক্বিরাআত, হা/৬৩; আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ পৃ. ৩৫, সনদ হাসান।
১৬. জুযউল ক্বিরাআত, হা/২৫৭; আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ পৃ. ৪১।
১৭. বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ, হা/৫৫৪, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি হাসান।
১৮. জুযউল ক্বিরাআত, হা/৫১, ‘ছহীহ’।
১৯. জুযউল ক্বিরাআত, হা/১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৫।
২০. জুযউল ক্বিরাআত, হা/২৮৩, সনদ ছহীহ।

www.al-itisam.com

আমি কী করব? আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ 'মনে মনে পড়ো'।[২১]

(২১) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পর্কে বলেছেন, بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'সূরা ফাতিহা পাঠ করো'।[২২]

(২২) উবাদা ইবনুছ ছমেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়ার পর বলেছেন, أَجَلْ؛ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا 'হ্যাঁ, এটি ব্যতীত ছালাত হয় না'।[২৩]

(২৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'তুমি ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পাঠ করো'।[২৪]

(২৪) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা এবং (সিররী ছালাতে) একটি সূরা পাঠ করার প্রবক্তা ছিলেন। ছাবেত ইবনু আসলাম আল-বুনানী (তাবেঈ) বলেছেন, كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ 'তিনি আমাদেরকে ইমামের পিছে ক্বিরাআত করার আদেশ করতেন'।[২৫]

(২৬) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রেওয়ায়াত আছে যে, كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'আমরা যোহর ও আছরে ইমামের পিছে প্রথম দু'রাকআতে ফাতিহাতুল কিতাব এবং অন্য কোনো একটি সূরা পাঠ করতাম। আর শেষের দু'রাকআতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তাম'।[২৬]

এ ব্যতীত অন্যান্য আছারের জন্য বায়হাক্বীর 'কিতাবুল ক্বিরাআত' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

তাবেঈদের আছার :

(১) 'আমি কি ইমামের পিছে ক্বিরাআত করবো?' এই প্রশ্নটির জবাব সাঈদ ইবনু জুবায়ের (এভাবে) দিয়েছেন যে, 'হ্যাঁ, যদিও তুমি তার ক্বিরাআত শুনতে পাও'।[২৭] অন্য আরেকটি রেওয়ায়াতে বলেছেন, لَا بُدَّ أَنْ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ 'অবশ্যই তোমাকে ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে'।[২৮]

(২) হাসান বাছরী বলেছেন, اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِكَ 'ইমামের পিছে প্রত্যেক রাকআতে তুমি মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে'।[২৯]

(৫) আবুল মালীহ উছামা ইবনু উমায়ের ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।[৩০]

(৬) হাকাম ইবনু উতায়বা বলেছেন, 'যেই ছালাতে ইমাম উচ্চৈঃস্বরে পড়ে না, তার প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং (অন্য কোনো) একটি সূরা পড়ো এবং শেষ রাকআতে (স্রেফ) সূরা ফাতিহা পড়ো'।[৩১]

(৭) উরওয়া ইবনুয যুবায়ের ইমামের পিছে সিররী ছালাতসমূহে (ফাতিহা ও ফাতিহার পরে আরও একটি সূরা) পড়তেন।[৩২]

(৮) কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইমামের পিছে অনুচ্চস্বরে (সিররী) ছালাতসমূহে (ফাতিহা এবং ফাতিহার পরে যা পাঠ করা হয়) পড়তেন।[৩৩]

(৯) নাফে' ইবনু জুবায়ের ইবনু মুত্বইম ইমামের পিছে সিররী ছালাতে (ফাতিহা এবং আরেকটি অতিরিক্ত সূরা) পড়তেন।[৩৪]

এ জাতীয় আরও দলীল রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, মুক্তাদীগণ ইমামের পিছে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তবে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সূরা ইমামের পিছে পড়া যাবে না। বরং ইমামের তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হবে।

(চলবে)

---

২১. জুযউল ক্বিরাআত, হা/৭৩, সনদ হাসান, তবে সাক্ষীমূলক বর্ণনা দ্বারা এটি ছহীহ।

২২. জুযউল ক্বিরাআত, হা/১১, ১০৫, সনদ হাসান; আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ, পৃ. ৬৮, ৬৯।

২৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৭৭০, সনদ ছহীহ; জুযউল ক্বিরাআত, হা/৬৫।

২৪. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৭৭৩, 'ছহীহ'; আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ পৃ. ৭০, ৭১।

২৫. বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত, হা/২৩১; আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ পৃ. ৭৩, সনদ হাসান।

২৬. ইবনু মাজাহ, হা/৮৪৩, সনদ ছহীহ।

২৭. জুযউল ক্বিরাআত, হা/২৭৩, সনদ হাসান।

২৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/২৭৮৯, ২/১৩৩; তাওযীহুল কালাম, ১/৫৩০; বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত, হা/২৩৭, শেষ ছত্র, আব্দুর রাযযাক হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

২৯. বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত, হা/২৪২; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/১৭১, সনদ ছহীহ; তাওযীহুল কালাম, ১/৫৩৮; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৭৬২।

৩০. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৭৬৮, সনদ ছহীহ; জুযউল ক্বিরাআত, হা/৪৬।

৩১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৭৬৬, সনদ ছহীহ; তাওযীহুল কালাম, ১/৫৫৫।

৩২. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৮৬, সনদ ছহীহ।

৩৩. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৮৭, সনদ ছহীহ।

৩৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৮৭, সনদ ছহীহ।

হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে গরু ও প্রাণীর মাংস খাওয়ার বিধান

-ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন)*

ইসলামে পশু-পাখির অধিকার :

শিরোনামটি অনেককে অবাক করবে। অনেকের ঠোঁট প্রসারিত হয়ে মুখে একটা মুচকি হাসি খেলে যাবে। হুহ! যে ধর্মে কুরবানী নামের 'পশুবলি উৎসব' আছে, সে ধর্মে আবার পশু অধিকার! আমাদের সমাজে এমন লোকের মোটেও অভাব নেই। কুরবানীর কারণে অনেকেই মনে করেন, ইসলাম একটা হিংস্র ধর্ম। অথচ সত্যটা একেবারেই উল্টো। ইসলাম পশু-পাখিদের যে অধিকার চৌদ্দশ' বছর আগে দিয়েছে, সেগুলোর জন্য মাত্র কিছু বছর থেকে সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থাগুলো ব্যবস্থা নিচ্ছে। ইসলামে জীবজন্তুদের অধিকার জানার আগে আমাদের একটা কথা জেনে নেওয়া উচিত। আল্লাহ পশু-পাখি এবং পৃথিবীর সবকিছু অর্থাৎ গাছ, পানি, আকাশ, সূর্য শুধু মানুষদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২৯)*।

ইসলামে বৈধ পশু-পাখি খাওয়া জায়েয। ইসলাম এমন অযৌক্তিক কথা বলে না যে, সকলে নিরামিষাশী হও অথবা প্রাণ খেয়ো না। এটা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন কথা। সকলে নিরামিষাশী হলে পৃথিবী টিকেই থাকত না। তাছাড়া উদ্ভিদেরও তো প্রাণ আছে, তাহলে মানুষ খাবে কী?

ইসলাম পশু-পাখি খাওয়ার অনুমতিও দিয়েছে আবার সেই সাথে কিছু সাবধানবাণীও দিয়েছে। ইসলাম পশু-পাখির ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। অকারণে তাদের মেরা ফেলা, খাওয়ার জন্য ছাড়া হত্যা করা, তাদের উপর বেশি বোঝা চাপানো, নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের কষ্ট দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর অভিশাপ সেই ব্যক্তির উপর, যে (অকারণে) পশুর অঙ্গহানি ঘটায়'।[১] অর্থাৎ শুধু মজা করার জন্য কোনো পশুর অঙ্গহানি করা যাবে না। তাকে কোনোভাবেই অকারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনে একটি সংগঠন প্রাণীদের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার হয়। ধীরে ধীরে তাদের চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশে দেশে। বলা যায়, তখন থেকেই সভ্য দুনিয়া পশু-পাখির প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনে মনোযোগী হয়েছে। পরে আরও কিছু সংগঠন প্রাণিজগতের অধিকার আন্দোলনে যোগ দেয়। তবে তাদের কার্যক্রম ছিল সচেতনতামূলক।

এর জন্য কারও ওপর আইনকানুন ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। অথচ আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীছে দেখতে পাই, প্রকৃতি ও প্রাণিজগৎ নিয়ে ইসলামের নির্দেশনা অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। ১৪০০ বছর পূর্বে পশু-পাখির অধিকার রক্ষায় ইসলাম নির্দিষ্ট আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। প্রাণীদের অধিকার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি শারঈ (ইসলামী) বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

পশু-পাখি মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ তাআলা এগুলোকে মানুষের করায়ত্ত করেছেন। এরা অবশ্যই করুণার পাত্র। ইসলাম ধর্ম মতে, পশু-পাখির সঙ্গে যথাসম্ভব দয়াশীল আচরণ করতে হবে। এদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে না।

প্রাণিজগৎকে পৃথক জাতিসত্তার স্বীকৃতি দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে বিচরণশীল যত প্রাণী আছে আর যত পাখি দুই ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়, তারা সবাই তোমাদের মতো একেক জাতি' *(আল-আনআম, ৬/৩৮)*।

নোট : পবিত্র কুরআনে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য আয়াতে প্রাণিজগতের প্রসঙ্গ এসেছে। এর বাইরেও পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রাণীর নামে অনেকগুলো সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ২ নং সূরা আল-বাক্বারা (গাভি), ৬ নং সূরা আল-আনআম (উট, গরু, বকরি), ১৬ নং সূরা আন-নাহল (মৌমাছি), ২৭ নং সূরা আন-নামল (পিপীলিকা), ২৯ নং সূরা আল-আনকাবূত (মাকড়সা), ১০৫ নং সূরা আল-ফীল (হাতি) ইত্যাদি। এসব নামকরণ থেকে প্রাণিজগতের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। পশু-পাখির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খাবারদাবার ও প্রয়োজনে ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম এগুলোকে প্রকৃতি ও পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

কুরআনের বক্তব্য দেখুন, 'প্রাণিকুল সৃষ্টির (অন্যতম) কারণ হলো, এগুলোতে তোমরা আরোহণ করে থাকো আর এগুলো সৌন্দর্যের প্রতীক' *(আন-নাহল, ১৬/৮)*। ইসলাম ধর্ম মতে, পশু-পাখির প্রতি নম্রতা প্রদর্শন ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া গুনাহের কাজ।

---

* মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. সুনানে নাসাঈ, হা/৪৪৪২।

প্রাণিজগতের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি :

একটি বিড়ালের বাচ্চাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান্নাম যাওয়ার সতর্ক বাণী। এমন শিক্ষা পৃথিবীর আর কোনো মানবতাবাদী দিয়েছেন, প্রমাণ পেশ করুন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) সূত্রে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে যাবে, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকামাকড় খেতে পারত। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রেও নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।[২]

একটি কুকুরকে পানি খাওয়ানোর কারণে জান্নাতের সুসংবাদ, এমন শিক্ষা পৃথিবীর আর কনো মানবতাবাদী দিয়েছেন, প্রমাণ পেশ করুন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ‘একবার একটি কুকুর এক কূপের চতুর্দিকে ঘুরছিল এবং অত্যন্ত পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর কাছে পৌঁছেছিল। তখন বানী ইসরাঈলের ব্যভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল এবং তার পায়ের মোজা দিয়ে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করালো। এ কাজের বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো’।[৩] ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? তিনি বললেন, نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ‘হ্যাঁ, প্রত্যেক দয়ালু অন্তরের অধিকারীদের জন্যে প্রতিদান আছে’।[৪]

পশু-পাখির যেহেতু বোধশক্তি নেই, ভালো-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই, তাই পশু-পাখির মাধ্যমে মানুষ বা সম্পদের কোনো ক্ষতি হলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। তবে এগুলোর সঙ্গে মালিক বা রাখাল থাকলে জরিমানা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘চতুষ্পদ জন্তুর অনিষ্ট ক্ষমাযোগ্য’।[৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যখন তোমরা জবাই করবে, সর্বোত্তম পন্থায় করবে। জবাইয়ের অস্ত্র ভালোভাবে ধার দিয়ে নেবে আর পশুটিকে স্বাভাবিকভাবে প্রাণ বের হওয়ার সুযোগ দেবে’।[৬]

নোট : এর ফলে ফুক্বাহায়ে কেরাম লিখেছেন, পশুদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এক পশুর সামনে অন্য পশু জবাই করা যাবে না। পরিপূর্ণ নিস্তেজ হওয়ার আগে ছুরিকাঘাত কিংবা চামড়া সরানো মাকরূহে তাহরীমী।

ইসলামে কোনো জীবন্ত পশু-পাখি আগুনে পোড়ানো নিষিদ্ধ :

আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজনে অন্যত্র গেলেন। আমরা দু’টি বাচ্চাসহ একটি পাখি দেখতে পেয়ে বাচ্চা দুটোকে ধরে নিলাম। মা পাখিটা সাথে সাথে আসলো এবং পাখা ঝাঁপটিয়ে বাচ্চার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিরে এসে বললেন, مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ قَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ‘কে এর বাচ্চা নিয়ে এসে একে অস্থিরতায় ফেলেছে? বাচ্চাগুলো এদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দাও। তিনি আমাদের পুড়িয়ে দেওয়া একটা পিঁপড়ার ঢিবি দেখতে পেয়ে বললেন, কে এগুলো পুড়িয়েছে?’ আমরা বললাম, আমরা। তিনি বললেন, ‘আগুনের রব ব্যতীত আগুন দিয়ে কিছুকে শাস্তি দেওয়ার কারও অধিকার নেই’।[৭]

পশু-পাখি জীবিত থাকা অবস্থায় তার কোনো অঙ্গ কর্তন করা যাবে না : আবূ ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আসলেন। এখানকার জনগণ জীবিত উটের কুঁজ ও মেষের লেজের গোড়ার গোশতপিণ্ডের অংশ কেটে খেত। তিনি বলেন, مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ‘জীবিত পশুর শরীরের কোনো অংশ কেটে আলাদা করা হলে তা মৃত হিসাবেই গণ্য’।[৮] সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রাহিমাহুল্লা-হ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)

---

২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩১৮, ২৩৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫৬; জামে‘ মা‘মার ইবনু রশীদ, হা/২০৫৪৯; সুনানে দারেমী, হা/২৮৫৬; মুসনাদে বাজ্জার, হা/৮৪৫৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৪৯৪; মুসনাদে আবী ইয়া‘লা, হা/৫৯৩৫, ৫৯৪২, ৬০৪৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৫৬২১; মু‘জামুল আওসাত্ব লিত তাবরানী, হা/৫৩১; মুসনাদে সামেইন লিত তাবরানী, হা/৩২৮১; শারহুস সুনন্না বাগাভী, ১৪/৩৮২; শুআবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী, ২/৩৯৩।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬৭; ছহীহ মুসলিম; হা/২২৪৫।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬০০৯, ১৭৩ (আধুনিক প্রকাশনী- ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৭৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৭১)।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৯১২।

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৫৫।

৭. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/২৬৭৫, সনদ ছহীহ।

৮. সুনানে তিরমিযী, হা/১৪৮০; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/৩২১৬; গায়াতুল মারাম, হা/৪১; ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/২৫৪৬, সনদ ছহীহ।

একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা একটি মুরগী বেঁধে সেটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। তারা ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা কে দেখে মুরগীটি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বললেন, مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا 'কে এ কাজ করল? যে এমন কাজ করে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লা'নত করেছেন'।[৯]

এছাড়াও বলা হয়েছে, একটা পশুর সামনে অন্য পশুকে যবেহ না করতে, মা পাখি থেকে তার শিশুকে আলাদা না করতে, পশু-পাখিকে খাবার না দিয়ে বেঁধে না রাখতে ইত্যাদি। এমনকি পশু-পাখিদের প্রতি দয়াপ্রদর্শনে আছে নেকী। একদা লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জীবজন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের ছওয়াব আছে? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) ছওয়াব বিদ্যমান'।[১০]

হিন্দুদের অবতারণা :

'গোমাংস' শব্দটি শুনলেই আজকাল অধিকাংশ হিন্দুরা আঁতকে উঠেন। গোমাংস তাদের কাছে নিষিদ্ধ এক বস্তু। তাই গোমাংস খাওয়ার অপরাধে ভারতে চলেছে হত্যা, নির্যাতন। গরু নিয়ে ভারতের রাজনীতি এখন সরগরম। গো-রক্ষার জন্যে গঠিত হয়েছে নানান দল। ভাগ্যচক্রে পশু গরু এখন হয়ে উঠেছেন গো-মাতা!

কিন্তু ইতিহাস বলে হিন্দুরা আগে গোমাংস খেত। তাহলে কেন তারা গোমাংস খাওয়া বন্ধ করল? কীভাবে হিন্দুদের গোমাংসের জোগান দেওয়া আদিম গরু আজকের গোমাতা হয়ে উঠল? এ সবই বিস্ময়কর রহস্যে আবৃত। সেই রহস্য ভেদ করা দুরূহ, দুঃসাধ্য। তবুও সেই রহস্যের যবনিকা সরানোর অদম্য ইচ্ছাতেই এই লেখাটি লিখছি।

অন্যান্য পশুর পাশাপাশি গোহত্যা ও গোভক্ষণও বৈদিক যুগে বহুল প্রচলিত ছিল। যদিও বৈদিক মানুষদের কাছে গরু নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বলে বিবেচিত হতো। গরু অর্থে 'গো' শব্দটি ঋগবেদের পারিবারিক মণ্ডলে ১৭৬ বার এসেছে[১১] এবং গবাদি পশু সম্পর্কিত শব্দসমূহ মোটামুটি ৭০০ বার এসেছে।[১২] বৈদিক যুগে একজন ধনী লোককে গোমত বলা হতো।[১৩] গোত্রের প্রধানকে বলা হতো গোপ বা গোপতি। গরুর জন্য অনেক যুদ্ধও সংঘটিত হতো। তাই গভিষ্টি,[১৪] গব্যু,[১৫] গবেষণ,[১৬] আভেস্তা[১৭]-এর মত যুদ্ধবাচক শব্দগুলো গবাদি পশু হতে এসেছে। কন্যাকে বলা হত দুহিতা (যে দুধ দোয়ায়)। এমনকি অনেক দেবতার উৎপত্তিও গরু থেকে দেখানো হয়েছে, তাদের গোজাত বলা হতো।[১৮] হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনেক শাস্ত্রে গোমাংসের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণগুলো দেওয়ার আগে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থের পরিচিতি :

হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রকে প্রধানত ৪টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— শ্রুতিশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও ঐতিহাসিক ধর্মগ্রন্থ। নিচে এসব হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো-

(ক) শ্রুতিশাস্ত্র : শ্রুতিশাস্ত্রের মূল অর্থ হলো সাধন বা ধ্যানযোগে পরমেশ্বরের বাণী শ্রবণ করে গুরুশিষ্য পরম্পরায় যা ধরে রেখেছিলেন তার থেকে সৃষ্ট গ্রন্থসমূহ। এর মূল গ্রন্থসমূহ হলো— বেদ, উপনিষদ, গীতা, শ্রী শ্রী চণ্ডী ইত্যাদি।

বেদ ধাতুগত অর্থের দিক থেকে বেদ হলো জ্ঞান বা বিদ্যা। বিদ্যা দুই প্রকার। যথা— পরাবিদ্যা বা পরম ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান এবং অপরা বিদ্যা বা লৌকিক জ্ঞান। বেদের সৃষ্টিকর্তা কোনো একজন পুরুষ নন। ঋষিদের ধ্যান উপলব্ধ জ্ঞানেই বেদের সৃষ্টি, তাই বেদ অপৌরুষেয়। পণ্ডিতদের অনেক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত প্রবর তিলক ও জ্যাকবির মতে, অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের মধ্যে বেদ রচিত হয়েছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে ৪ ভাগে ভাগ করেন। যথা— ঋক, সাম, যজু ও অর্থব। ঋক অর্থ মন্ত্র। তাই ঋকবেদে মন্ত্রের মাধ্যমেই দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে। ঋকবেদে মোট ১০টি মণ্ডল, ১০২৮টি সূক্ত এবং ১০৫৫২টি ঋক বা মন্ত্র রয়েছে। সাম অর্থ সঙ্গীত। তাই সামবেদে উল্লিখিত মন্ত্রগুলো যজ্ঞের সময় সুর করে গাওয়া হতো। সামবেদে মন্ত্র সংখ্যা ১৮১০টি। ক্রমানুযায়ী সামবেদের পরেই যজুর্বেদের অবস্থান। যজ ধাতুর অর্থ যোজন

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৫৮।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৪৪।
১১. R.S. Sharma, Material Culture and Social Formations in Ancient India, Macmillan, Delhi, 1983, p. 24.
১২. Srinivasan, Concept of Cows in the Rigveda, Motilal BanarsiDass, Delhi, 1979, p, 1.
১৩. ঋগবেদ (২/৪১/৭) (৬/৪৫/১৬) (৭/২৭/৫) (৭/২৭/৫) (৭/৭৭/৫) (৭/৯৪/৯) (৯/৬১/৩)।
১৪. ঋগবেদ (৩/৪৭/৪) (৫/৬৩/৫) (৬/৩১/৩) (৬/৪৭/২০) (৬/৫৯/৭) (৮/২৪/২) (৯/৬৭/২)।
১৫. ঋগবেদ (৮/৫৩/৮) (৯/২৭/১৫)।
১৬. ঋগবেদ (৭/২৩/৩) (৮/১৭/১৫)।
১৭. ঋগবেদ (৫/২০/১১)।
১৮. ঋগবেদ (৬/৫০/১১) (৭/৩৫/১৪) (১০/৫৩/৫)।

করা। তাই যজুর্বেদ অর্থে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বেদ বুঝায়। যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা— শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। শুক্লযজুর্বেদে ৪০টি অধ্যায়, ৩০৩টি অনুবাক ও ১৯১৫টি কণ্ডিকা বা মন্ত্র রয়েছে। কৃষ্ণযজুবেদের তৈত্তিরীয় শাখাতে মোট ৭টি কাণ্ড, ৪৪টি প্রশ্ন, ৬৪৪টি অনুবাদ ও ১৯১৫টি কণ্ডিকা বা মন্ত্র রয়েছে। সবশেষে অথর্ববেদে ভোজবিদ্যা, ব্যাধি নিরাময়, পুত্রেষ্টিক্রিয়া, অনাবৃষ্টি নিবারণ, শত্রুবধ, উচাটন ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। অথর্ববেদের শৌনিক শাখায় মোট ৫৯৭৭টি মন্ত্র সংকলিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ : বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে গ্রন্থে পুরোহিতগণের নেতৃত্বে যজ্ঞ ও তার বিধিবিধান আলোচিত হয়, সে গ্রন্থই ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। বেদশাস্ত্র সঠিকভাবে পাঠ করার জন্য ৬টি বেদাঙ্গ রয়েছে। যথা— শিক্ষা (পাণিনি), কল্প (বিভিন্ন ঋষি সম্প্রদায়), ব্যাকরণ (পাণিনি) নিরুক্ত (যাস্ক), ছন্দ (পিঙ্গলাচার্য), জ্যোতিস্ক (গর্গ)।

মূল ৪টি বেদ ছাড়াও ৪টি উপবেদ আছে। যেমন— আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্বেদ, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি।

বেদের দুটি শাখা : একটি আরণ্যক ও অপরটি উপনিষদ। অরণ্যে বসে যা রচিত তাই আরণ্যক। উল্লেখযোগ্য আরণ্যকগুলো হলো— ঐতরেয়, কৌষীতকি, শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য ইত্যাদি। উপনিষদ হলো গুরুর নিকট হতে প্রাপ্ত জ্ঞান। আচার্য শঙ্করের মতে ১০টি প্রধান উপনিষদ আছে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন। ১০টি উপনিষদ হলো— বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য। উপনিষদের পাঁচটি মূলতত্ত্ব হলো— সর্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজিত, বহুত্বের মধ্যে ব্রহ্মের একত্ব, ব্রহ্ম অন্তরস্থিত হয়েও বিশ্বনিয়ন্তা, ব্রহ্ম রসস্বরূপ ও ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

গীতা : মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কালজয়ী তত্ত্বজ্ঞান ও উপদেশ দিয়েছিলেন, তার সংকলনই শ্রীমদভগবত গীতা। গীতায় ১৮টি অধ্যায় ও ৭০০ শ্লোক রয়েছে। এটি একটি নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ।

শ্রী শ্রী চণ্ডী : মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অংশের নাম শ্রী শ্রী চণ্ডী। চণ্ডী শব্দের অর্থ পরম ব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্ম শক্তি। এতে ব্রহ্ম শক্তি দুর্গার স্তুতি রয়েছে। চণ্ডীতে ঈশ্বর মাতৃজ্ঞানে পূজিত হন। চণ্ডীতেও গীতার মত ৭০০ শ্লোক রয়েছে।

(খ) স্মৃতিশাস্ত্র : বিভিন্ন ঋষির স্মৃতি ও বাণী যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাই স্মৃতিশাস্ত্র। যে কুড়িটি স্মৃতিশাস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হলো— মনুসংহিতা, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবাল্ক, পরাশর, ব্যাস, উশনা, অঙ্গিরা, যম, অপস্তম্ভ, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শততাপ ও বশিষ্ঠ নামক স্মৃতিশাস্ত্র।

(গ) পুরাণ : পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরাণ বেদের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। বেদে জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য ছিল। পুরাণের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের ভক্তিবাদ ও মূর্তিপূজার সূচনা হয়। পুরাণ অনেক, তবে মহাপুরাণ ১৮টি এবং সেগুলো হলো— ব্রহ্মা, শিব, পদ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত, মার্কাণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রাহ্মবৈবর্ত, মৎস্য লিঙ্গ, বরাহ, কুর্ম, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, নারদীয়, স্কন্দ ও বায়ু পুরাণ। ভাগবতে কথিত আছে যে, পুরাণের মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ। ভাগবতে ১২টি স্কন্দ ও ৬২০০০টি শ্লোক রয়েছে। ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং শ্রী হরির গুণ ও লীলার যে বর্ণনা করেছিলেন, তাই ভাগবত। ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব সর্বপ্রথম পিতা ব্যাসদেবের নিকট ভাগবত শোনেন এবং তা রাজা পরীক্ষিতকে শোনান। ভাগবতের মূলতত্ত্ব হলো ভক্তি।

(ঘ) ঐতিহাসিক ধর্মগ্রন্থ : মূলত রামায়ণ ও মহাভারতকেই ঐতিহাসিক ধর্মগ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। রামের জন্মের ৫০ বছর পূর্বে ঋষি বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচিত হয়। রামায়ণে ৭টি কাণ্ড। যথা— আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা। এতে ২৪০০০টি শ্লোক রয়েছে। মহাভারত রচনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। মহাভারতে কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে। যুদ্ধে সত্যধর্ম অবলম্বনকারী পাণ্ডবদের জয় হয়। মহাভারতে ১৮টি পর্ব ও ৮৫০০০টি শ্লোক রয়েছে। পর্বগুলো হলো— ১. আদি ২. সভা ৩. বন ৪. বিরাট ৫. উদ্যোগ ৬. ভীষ্ম ৭. দ্রোণ ৮. কর্ণ ৯. শৈল্য ১০. গদা ১১. সৌপ্তিক ১২. ঋষীক ১৩. স্ত্রী ১৪. শান্তি ১৫. অশ্বমেধ ১৬. আশ্রমিক ১৭. মুষল ও ১৮. স্বর্গারোহণ পর্ব।

এছাড়াও বিভিন্ন কাব্য, মহাকাব্য, পদাবলি, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থও ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। হিন্দুধর্মে ষড়দর্শনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষড়দর্শন হলো— ১. স্যাংখ্য (কপিল) ২. যোগ (পতঞ্জলি) ৩. ন্যায় (গৌতম) ৪. বৈশেষিক (কণাদ) ৫. পূর্ব মীমাংসা (জৈমিনি) ও ৬. উত্তর মীমাংসা (বেদব্যাস)।

বেদ ৪টি, মন্ত্রসংখ্যা ২০,৪৩৪টি। যথা— ১. ঋগবেদ, মন্ত্রসংখ্যা ১০,৫৮৯টি ২. সামবেদ, মন্ত্রসংখ্যা ১,৮৯৩টি ৩. যজুর্বেদ, মন্ত্রসংখ্যা ১,৯৭৫টি ৪. অথর্ববেদ, মন্ত্রসংখ্যা ৫,৯৭৭টি।

উপবেদ ৪টি। যথা— ১. আয়ুর্বেদ ২. ধনুর্বেদ ৩. গন্ধর্ববেদ ৪. অর্থশাস্ত্র।

বেদাঙ্গ ৬টি। যথা— ১. শিক্ষা- পাণিনী ২. কল্প- বিভিন্ন ঋষি সম্প্রদায় ৩. ব্যাকরণ- পাণিনী ৪. নিরুক্ত- যাস্ক ৫. ছন্দ- পিঙ্গলাচার্য ৬. জ্যোতিষ- গর্ণ।

বেদের উপাঙ্গ ৪টি। যথা— ১. পুরাণ ২. মীমাংসা ৩. ন্যায় ৪. ধর্মশাস্ত্র।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড ২টি। যথা— ১. আরণ্যক ২. উপনিষদ।

আরণ্যক ৪টি। যথা— ১. ঐতেরেয় ২. কৌষীতকী ৩. শতপথ ব্রহ্মণ ৪. ছান্দোগ্য।

১০৮টি উপনিষদের মধ্যে প্রধান উপনিষদ ১২টি। যথা ১. বৃহদারণ্যক মন্ত্র ৪৩৫টি, ২. ছান্দোগ মন্ত্র ৬৬৮টি, ৩. তৈত্তিরীয় মন্ত্র ৬৮টি ৪. ঐতরেয় মন্ত্র ৩৩টি ৫. ঈশোপনিষ মন্ত্র ১৮টি ৬. কেন উপনিষদ ৩৫টি ৭. কঠো উপনিষদ ১১৯টি ৮. প্রশ্ন উপনিষদ ৬৭টি ৯. মুণ্ডকোপনিষদ ৬৫টি ১০. মাণ্ডুক্য উপনিষদ ১২টি ১১. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ মন্ত্র ১১৩টি ১২. কৌষীতকী উপনিষদ মন্ত্র ৪৯টি।

ষড়দর্শন ৬টি। যথা— ১. সাংখ্য দর্শন- মহর্ষি কপিল ২. যোগ দর্শন- পাতঞ্জলি ৩. ন্যায় দর্শন- গৌতম ৪. বৈশেষিক দর্শন- কণাদ ৫. পূর্ব মীমাংসা- জৈমিনী ৬. উত্তর মীমাংসা বেদান্ত দর্শন- ব্যাসদেব।

মীমাংসা ২টি। যথা— ১. কর্ম মীমাংসা ২. ব্রহ্ম মীমাংস বা বহ্মসূত্র।

বেদাঙ্গে গৃহ্য সূত্রে : আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে, পারস্কর গৃহ্য সূত্রে, বৈখানস গৃহ্য সূত্রে, আপস্তম্ভ গৃহ্য সূত্রে, শঙ্খায়ণ গৃহ্য সূত্রে, গোভিল গৃহ্য সূত্রে, খাদির গৃহ্য সূত্রে, হিরণ্যকেশী গৃহ্য সূত্রে।

স্মৃতি সংহিতা (সমাজ ব্যবস্থাপক শাস্ত্র) ২০টি। যথা— ১. মনু সংহিতা ২. অত্রি সংহিতা ৩. বিষ্ণু সংহিতা ৪. হরিত সংহিতা ৫. যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৬. পরাশর সংহিতা ৭. ব্যাস সংহিতা ৮. উশনা সংহিতা ৯. অঙ্গিরা সংহিতা ১০. যম সংহিতা ১১. অপস্তম্ভ সংহিতা ১২ সম্বর্ত সংহিতা ১৩. কাত্যায়ন সংহিতা ১৪. বৃহস্পতি সংহিতা ১৫. শঙ্খ সংহিতা ১৬. লিখিত সংহিতা ১৭. দক্ষ সংহিতা ১৮. গৌতম সংহিতা ১৯ তাতপ সংহিতা ২০. বশিষ্ট সংহিতা।

পুরাণ ২টি। যথা— ১. মহাপুরাণ ২. উপপুরাণ।

মহাপুরাণ ১৮টি। যথা— ১. ব্রহ্ম পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১০,০০০টি ২. শিব পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ২৪,০০০টি ৩. পদ্ম পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ৫৫,০০০টি ৪. বিষ্ণু পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ২৩,০০০টি ৫. ভাগবত পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১৮,০০০টি ৬. মার্কণ্ডেয় পুনাণ, মন্ত্রসংখ্যা ৯,০০০টি ৭. অগ্নি পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ৫,৪০০টি ৮. ভবিষ্যত পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১৪,৫০০টি ৯. ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১৮,০০০টি ১০. মৎস পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১৪,০০০টি ১১. লিঙ্গ পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১১,০০০টি ১২. বরাহ পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ২৪,০০০টি ১৩. কুর্ম্ম পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১৭,০০০টি ১৪.গরুড় পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১৯,০০০টি ১৫. ব্রহ্মা পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১২,০০০টি ১৬. নারদীয় পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ২৫,০০০টি ১৭. স্কন্দ পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ৮১,১০১টি ১৮. বামন পুরাণ, মন্ত্রসংখ্যা ১০,০০০।

উপপুরাণের বর্ণিত তালিকাটি পাওয়া যায় : আদি পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, নন্দীশ্বর পুরাণ, বৃহন্নন্দীশ্বর পুরাণ, সাম্ব পুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, কালিকা পুরাণ, ধর্ম পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, শিবধর্ম পুরাণ, বিষ্ণুধর্ম পুরাণ, বামন পুরাণ, বরুণ পুরাণ, নরসিংহ পুরাণ, ভার্গব পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ।

মহাপুরাণগুলোর মতো অধিকাংশ উপপুরাণও উপকরণগত দিক থেকে সাম্প্রদায়িক চরিত্রের। উপপুরাণগুলোকে সম্প্রদায়ভেদে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও অসাম্প্রদায়িক— এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

বৈষ্ণব উপপুরাণ সম্পাদনা : বৈষ্ণব উপপুরাণগুলোর মধ্যে প্রধান— বিষ্ণুধর্ম পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, নরসিংহ পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও ক্রিয়াযোগসার।

শাক্ত উপপুরাণ সম্পাদনা : শাক্ত উপপুরাণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য— দেবী পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মহাভাগবত পুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণ, ভগবতী পুরাণ, চণ্ডী পুরাণ (বা চণ্ডিকা পুরাণ) ও সতী পুরাণ।

শৈব উপপুরাণ সম্পাদনা : শৈব উপপুরাণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— শিব পুরাণ, সৌর পুরাণ, শিবধর্ম পুরাণ, শিবধর্মোত্তর পুরাণ, শিবরহস্য পুরাণ, একাম্র পুরাণ, পরাশর পুরাণ, বশিষ্ঠলৈঙ্গ পুরাণ ও বিখ্যাদ পুরাণ।

শিবধর্ম পুরাণে শুধু ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ আছে। এটি একটি ধর্মশাস্ত্র হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। সৌর উপপুরাণ সম্পাদনা। সাম্ব পুরাণ হলো একমাত্র সৌর উপপুরাণ। গাণপত্য উপপুরাণ সম্পাদনা। মুদগল পুরাণ ও গণেশ পুরাণ হলো দুটি গাণপত্য উপপুরাণ। অসাম্প্রদায়িক পুরাণ সম্পাদনা। ভবিষ্যোত্তর পুরাণ, কপিল পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত নয়।

ইতিহাস : রামায়ণ, মহাভারত, দেবী ভগবত (শক্ত সম্প্রদয়), শ্রীমদ্ভাগবদ (বৈষ্ণব সম্প্রদায়), চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, মন্ত্রসংখ্যা ৭০০টি, শ্রীশ্রী চণ্ডী, মন্ত্রসংখ্যা ৭০০টি।

(চলবে)

আরাফার দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

আরাফার দিন অতি মর্যাদাসম্পন্ন এক দিন। যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখকে আরাফার দিন বলা হয়। এ দিনটি অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ দিনের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ। দ্বীনে ইসলামের পূর্ণতা লাভ, বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিন। হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشُكُّ- كَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَمْ لاَ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾.

ত্বারেক ইবনু শিহাব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীরা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল, আপনারা এমন একটি আয়াত তিলাওয়াত করে থাকেন, যদি সেটি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হতো তাহলে আমরা সে দিনটিকে ঈদ হিসাবে উদযাপন করতাম। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে বললেন, আমি অবশ্যই জানি কখন তা অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় তা অবতীর্ণ হয়েছে, আর অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ছিলেন। হ্যাঁ, সে দিনটি হলো আরাফার দিন। আল্লাহর শপথ! আমরা সে দিন আরাফার ময়দানে ছিলাম। আয়াতটি হলো, ﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾ ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করেছি ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান হিসাবে মনোনীত করেছি’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*।[১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ সহ অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, এ আয়াত নাযিলের পূর্বে মুসলিমগণ ফরয হিসাবে হজ্জ আদায় করেননি। তাই ফরয হিসাবে হজ্জ আদায় করার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।[২]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সূরা আল-মায়েদার এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে দুটি ঈদের দিনে। তা হলো জুমআর দিন ও আরাফার দিন।[৩]

এ দিন হলো ঈদের দিনসমূহের একটি দিন। আবূ উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَاَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا اَهْلَ الاِسْلاَمِ وَهِىَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ ‘আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও আইয়ামে তাশরীক (কুরবানীর পরবর্তী তিন দিন) আমাদের ইসলামের অনুসারীদের ঈদের দিন। আর এ দিনগুলো খাওয়া ও পান করার দিন’।[৪] ইতোপূর্বে আলোচিত উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِى يَوْمِ عِيدٍ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ ‘সূরা আল-মায়েদার এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে দুটি ঈদের দিনে। তা হলো জুমআর দিন ও আরাফার দিন’।[৫]

উক্ত হাদীছ দুটি দ্বারা বুঝা যায় যে, আরাফার দিনকে ঈদের দিনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করা : এ দিনে ছিয়াম পালন করা অনেক ফযীলতপূর্ণ। আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ ‘আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে আশা করি যে, তিনি আরাফার দিনের ছিয়ামের বিনিময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[৬]

মনে রাখতে হবে যে, আরাফার দিনে ছিয়াম তারাই রাখবেন, যারা হজ্জ পালনরত নন। যারা হজ্জ পালনরত, তারা আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করবেন না।

আরাফার দিনে হজ্জ পালনরত ব্যক্তি রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণ করেই সে দিনের ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন। যেন তিনি আরাফাতে অবস্থানকালীন সময় বেশি বেশি করে যিকির, দু‘আসহ অন্যান্য আমলে তৎপর থাকতে পারেন।

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৬০৬।

২. ইবনু রজব, লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ৪৮৬।

৩. জামে‘ তিরমিযী, হা/৩০৪৩, সনদ ছহীহ।

৪. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/২৪১৯, হাদীছ ছহীহ।

৫. জামে‘ তিরমিযী, হা/৩০৪৪, হাদীছ হাসান।

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।

কিন্তু এ দিনে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী হাজীগণ ছিয়াম পালন করবেন না। হাদীছে এসেছে-

عَنْ مَيْمُوْنَةَ ﵂ أَنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

মায়মূনা ﵂ থেকে বর্ণিত, লোকজন আরাফার দিন নবী ﷺ-এর ছিয়াম রাখা সম্পর্কে সন্দেহ করছিল। (তিনি বলেন,) তখন আমি তাঁর নিকটে কিছু দুধ পাঠালাম। এ সময় তিনি আরাফায় অবস্থানরত ছিলেন। তখনই তিনি সেই দুধ পান করলেন আর লোকজন তা দেখছিল'।[৭]

এ দিনে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সকল হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মুসনাদে আহমাদে ইবনু আব্বাস ﵂ থেকে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيْهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ غُفِرَ لَهُ 'এ দিনে যে ব্যক্তি নিজ কান ও চোখের নিয়ন্ত্রণ করবে, তাকে ক্ষমা করা হবে'।[৮]

মনে রাখা দরকার যে, শরীরের অঙ্গসমূহকে হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে হেফাযত করা যেমন ছিয়ামের দাবি, তেমনি হজ্জেরও দাবি। কাজেই সর্বাবস্থায় এ দিনে এ বিষয়টির প্রতি যত্নবান হতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ পরিহার করতে হবে।

আরাফার দিনে অধিক পরিমাণে যিকির ও দু'আ করা : নবী কারীম ﷺ বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কথা যা আমি বলি ও নবীগণ বলেছেন, তা হলো,

لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, আর সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান'।[৯]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্দিল বার্র ﵀ বলেছেন, 'এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরাফার দিনের দু'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হবে। আর সর্বোত্তম যিকির হলো লা-ইলাহা ইল্লাললাহ'।[১০] ইমাম খাত্তাবী ﵀ বলেছেন, 'এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, দু'আ করার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রশংসা ও তাঁর মহত্ত্বের ঘোষণা দেওয়া উচিত'।[১১]

আরাফার দিন গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন : আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلاَءِ 'আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরাফার দিনে এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, যা অন্য কোনো দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদের নিয়ে ফেরেশতাগণের সামনে গর্ব করে বলেন, 'তোমরা কি বলতে পারো, আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কী চায়?'[১২]

ইমাম নববী ﵀ বলেছেন, 'এই হাদীছটি আরাফার দিনের ফযীলতের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইবনু আব্দিল বার ﵀ বলেছেন, 'এ দিনে মুমিন বান্দারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। কেননা, আল্লাহ রব্বুল আলামীন গুনাহগারদের নিয়ে ফেরেশতাগণের সামনে গর্ব করেন না। কিন্তু তওবা করার মাধ্যমে ক্ষমাপ্রাপ্তির পরই তা সম্ভব'।

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, اِنَّ اللهَ يُبَاهِيْ بِاَهْلِ عَرَفَاتٍ اَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ : اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِيْ جَاءُوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরাফায় অবস্থানরতদের নিয়ে আসমানবাসীদের সামনে গর্ব করেন। আল্লাহ তাদের বলেন, 'আমার এ সকল বান্দাগণের দিকে চেয়ে দেখো! তারা এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে'।[১৩]

শেষকথা, আমাদের মুসলিম হিসাবে আরাফার গুরুত্ব বুঝে আরাফাকেন্দ্রিক আমলসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে বিশেষ ফযীলত অর্জনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আল্লাহ যেন সেই তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮৯।
৮. মুসনাদে আহমাদ, হা/৩০৪২, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের।
৯. তিরমিযী, হা/৩৫৮৫, হাদীছ হাসান।
১০. ইবনু আবদুল বার, আত-তামহীদ।
১১. ইমাম খাত্ত্বাবী, শান আদ-দু'আ, পৃ. ২০৬।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৮।
১৩. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২৮৩৯।

ঈদুল আযহা : শিক্ষা ও করণীয়

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

কবির ভাষায়—

‘ঈদুল আযহা এলো আবার
মনের পশুর সাথে...
টাকার পশু কুরবানি দাও
বিলাও গোস্ত হাতে।’

আত্মত্যাগ ও মানবতার বার্তা নিয়ে প্রতিবছর বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সামনে হাযির হয় ‘ঈদুল আযহা’। যা জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সৌহার্দপূর্ণ ইবাদাতের মাধ্যমে পালিত হয়।

মক্কা নগরীর জনমানবহীন ‘মিনা’ প্রান্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দুই নিবেদিতপ্রাণ বান্দা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অতুলনীয় ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে ‘ঈদুল আযহা’ বা কুরবানীর ঈদ।

কবির ভাষায়—

‘দিবে পশু কুরবানি আজ নেকি ভালো হবে...
আবার এলো কুরবানি ঈদ কুরবানি দাও সবে।’

‘কুরবানী’ শব্দের অর্থ : কুরআনুল কারীমে ‘কুরবানী’র বদলে ‘কুরবান’ শব্দটি এসেছে। হাদীছে ‘কুরবানী’ শব্দের পরিবর্তে ‘উযহিয়্যা’ ও ‘যাহিয়্যা’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এজন্যই কুরবানীর ঈদকে ‘ঈদুল আযহা’ বলা হয়।

অন্যদিকে ‘কুরবানী’ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো নৈকট্য অর্জন করা, কারো কাছাকাছি যাওয়া। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পশু জবাই করা।

ঈদুল আযহার গুরুত্ব : কুরআনুল কারীম এবং হাদীছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ ‘আর কুরবানীর পশুসমূহকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৩৬)*। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন, ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ‘আর আমরা তাঁর (ইসমাঈলের) পরিবর্তে এক মহান কুরবানী (দুম্বা) প্রদান করলাম। আমরা এটিকে (তাঁর আদর্শকে) পরবর্তীদের জন্য (অনুসরণীয়) করে রেখে দিলাম’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৭-১০৮)*। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো বলেছেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করো এবং কুরবানী করো’ *(আল-কাওছার, ১০৮/২)*। হাদীছে এসেছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি সাদা-কালো বর্ণের ভেড়া দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাকে দেখতে পাই, তিনি ভেড়া দুটির পার্শ্বদেশে পা রেখে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়ে নিজের হাতে সে দুটোকে যবেহ করেন।[১] ‘সুন্নাতে ইবরাহীম’ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রতিবছর নিজে এবং ছাহাবীগণও কুরবানী করেছেন। এটি কিতাব ও সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত।

ঈদুল আযহার লক্ষ্য : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হতাশা, দুর্দশা, অশান্তি ও অস্থিরতা ইত্যাদি দূরীকরণের জন্য ‘ঈদুল আযহা’ এর ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য করেছেন। যারা অভাবী ও দরিদ্র তাদের জীবনে আনন্দ দেওয়া, দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে তাদেরকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা, যা সামর্থ্যবান মুসলিমদের নৈতিক কর্তব্য।

আন্তরিকতা এবং নম্রতার সাথে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা একই কাতারে দাঁড়িয়ে পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ তা ভুলে যায়। পরস্পরে কুশলাদি বিনিময় করে আনন্দ ভাগাভাগি করে, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং আন্তরিকতাপূর্ণ মহানুভবতায় ভরে দেয়।

ঈদুল আযহার তাৎপর্য : আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম -এর দুই পুত্র কাবীল ও হাবীলের দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়। তারপর থেকে সকল উম্মতের

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৬; মিশকাত, হা/১৪৫৩।

উপর পর্যায়ক্রমে এর প্রচলন ছিল। আমাদের উপর যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, তা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে।

কবির ভাষায়—

'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ
আজি আল্লাহর নামে জান কোরবানে
ঈদের পূত বোধন।'

ঈদুল আযহা মূলত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর পরম ত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত উৎসব। সূরা আল-হাজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে মুসলিম জাতির পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পরিবারটি বিশ্ব মুসলিমের জন্য আত্মত্যাগের এক মহত্তম আদর্শ।

কুরবানীর স্মৃতিবাহী যিলহজ্জ মাসে হজ্জ উপলক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মুসলিম সমবেত হয় মক্কা-মদীনায়। তাঁরা ইবরাহীমী আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন। আমরা নিবিড়ভাবে অনুভব করি বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব।

ঈদুল আযহা উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কুরবানী। মানুষ কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হতে চায়। আল্লাহর জন্য মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে রাজি আছে কি-না সেটাই পরীক্ষার বিষয়। কুরবানী আমাদের সেই পরীক্ষার কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদেরকে এখন আর নিজ পুত্র কুরবানী দেওয়ার মতো এত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় না। একটি হালাল পশু কুরবানী করেই আমরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি। কুরবানীর মাধ্যমে আত্মত্যাগ ও আত্ম উৎসর্গের যে মহান শিক্ষা আমরা লাভ করি, সেই শিক্ষার আলোকে সারা বছরই আপন সম্পদ অন্য মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। এই ত্যাগের মনোভাব যদি গড়ে ওঠে, বুঝতে হবে কুরবানীর ঈদ স্বার্থক। নইলে এটি চিরকাল নামমাত্র ভোগবাদী অনুষ্ঠান ছাড়া আর অন্য কিছু হিসেবে বিবেচিত হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল সম্পদের কিছু অংশ এবং আমি তোমাদের জন্য যমীন হতে যা উৎপাদন করেছি, তা থেকে ব্যয় করো' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৭)*।

চিত্ত আর বিত্তের মিল ঘটানোর জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমে বারবার মানুষকে আত্মত্যাগের আহ্বান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরবানীদাতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ 'কুরবানীর পশুর রক্ত, গোশত কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, পৌঁছে কেবল তোমাদের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি' *(আল-হজ্জ, ২২/৩৭)*। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পুত্র কুরবানীর ন্যায় ত্যাগ ও পবিত্র আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করা ও তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করাই কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য।

ঈদুল আযহাকেন্দ্রিক আমল : কুরআনুল কারীমের ভাষ্যমতে চারটি মাস অধিক সম্মানিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারোটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত' *(আত-তাওবা, ৯/৩৬)*।

এই চারটি মাসের অন্যতম হলো যিলহজ্জ মাস। আর এ মাসের ফযীলতপূর্ণ সময় হলো 'আশারায়ে যিলহজ্জ' অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দশকের রাত্রির শপথ করেছেন, ﴿وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ 'শপথ ফজরের, শপথ দশ রাত্রির' *(আল-ফাজর, ৮৯/১-২)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ সহ অনেক ছাহাবী, তাবেঈ ও মুফাসসির বলেন, এখানে 'দশ রাত্রি' দ্বারা যিলহজ্জের প্রথম দশ রাতকে বুঝানো হয়েছে।[২]

ঈদুল আযহা কেন্দ্রিক আমল সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর নিকট যিলহজ্জের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নয়। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও (এর চেয়ে উত্তম) নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির জিহাদ এর চেয়ে উত্তম, যে নিজের জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) বের হয়েছে। অতঃপর কোনো কিছু নিয়ে ফিরে আসেনি'।[৩]

এই দশকের মধ্যে বেশ কয়েকটি আমল রয়েছে। যেমন—

২. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৪/৫৩৫।

৩. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৮; ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৯; জামে' তিরমিযী, হা/৭৫৭; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭; মুসনাদে আহমদ, হা/১৯৬৮।

www.al-itisam.com

১. যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত বেশি বেশি তাকবীর পাঠ করা।

২. নখ-চুল না কাটা।
৩. রাত্রগুলোতে বেশি যিকির-তাসবীহ করা।
৪. প্রথম নয় দিন ছিয়াম রাখা।
৫. আরাফার দিন অর্থাৎ নয় যিলহজ্জ ছিয়াম রাখা।
৬. আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়্যামে তাশরীক (১৩ তারিখ) আছর পর্যন্ত প্রতি ছালাতের পরে তাকবীর পড়া।
৭. কুরবানী করা।
৮. ঈদুল আযহার ছালাত পড়া।
৯. ঈদ ও আইয়ামে তাশরীকে ছিয়াম না রাখা।

নখ-চুল না কাটা : হাদীছে এসেছে, উম্মে সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন যিলহজ্জের দশক শুরু হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে কুরবানী করবে সে যেন তার চুল-নখ না কাটে’।[৪]

বেশি বেশি ইবাদত ও যিকির করা : হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলার নিকট আশারায়ে যিলহজ্জের আমলের চেয়ে অধিক মহৎ এবং অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নয়। সুতরাং তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং আল-হামদুলিল্লাহ পড়ো’।[৫]

যিলহজ্জের প্রথম নয় দিন ছিয়াম রাখা : হাদীছে এসেছে, ‘রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত, আশুরার দিন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন, মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন’।[৬]

আরাফার দিন অর্থাৎ নয় যিলহজ্জ ছিয়াম রাখা : হাদীছে এসেছে, আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়াওমে আরাফার (নয় যিলহজ্জ) ছিয়ামের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তিনি এর দ্বারা এর আগের এক বছরের এবং পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।[৭]

তাশরীকের দিনগুলোতে তাকবীর পড়া : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী, ‘আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো (আইয়ামে তাশরীকের) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে’ *(আল-বাক্বারা, ২/২০৩)*।

ঈদুল আযহার ছালাতের আগে কিছু না খাওয়া : হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরে কিছু না খেয়ে ছালাতের জন্য বের হতেন না, আর কুরবানীর ঈদে ছালাতের আগে কিছু খেতেন না।[৮]

কুরবানী ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। কবির ভাষায়—

‘তোরা ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ।’

ঈদুল আযহার মূল আহ্বান হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা। সকল দিক হতে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহর দিকে রুজূ হওয়া। সম্পদের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ ও স্ত্রীর মহব্বত সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেওয়াই হলো ঈদুল আযহার মূল শিক্ষা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ‘তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের ভয় কর, তাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ’ *(আল-মুমতাহিনা, ৬০/৪-৬)*।

পরিশেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি। হে আল্লাহ! দেশে দেশে মহামারি করোনার কবল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করো। ঈদুল আযহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে সবাইকে উৎসবটি পালন করার তাওফীক্ব দাও- আমীন!

কবির ভাষায়—

‘দেশে এখন কোভিড উনিশ আসছে তবু ঈদ
কুরবানীটা কেমনে হবে ভেবে হারাম নিদ।
বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ কমে গেছে আয়
ঈদুল আযহা কুরবানী ঈদ কেমনে হবে হায়!
কোভিড থাবায় মরছে মানুষ খবর আসে রোজ
এবার ঈদে কেহ কারো খোঁজ নিবে কি খোঁজ?
আনন্দটা ধূলিমলিন এমন খুশির দিন
কুরবানী ঈদ কোভিড উনিশ সব করেছে লীন।’

---

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭; জামে‘ তিরমিযী, হা/১৫২৩।
৫. মুসনাদে আহমদ, ২/৫৭, হা/৫৪৪৬; ত্বাবারানী কাবীর, ১১/৬৮ হা/১১১১৬; মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বা, হা/১৪১১০।
৬. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২২৩৪; সুনানে নাসাঈ, হা/২৪১৬।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; জামে‘ তিরমিযী, হা/৭৪৯; সুনানে আবূ দাঊদ, হা/২৪২৫।
৮. জামে‘ তিরমিযী, ১/৭১, হা/৫৪২।

আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনে কিছু উপদেশ

*[১ শাওয়াল, ১৪৪২ হি. মোতাবেক ১৪ এপ্রিল, ২০২১। পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার (মসজিদে নববী) ঈদুল ফিতরের খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. আহমাদ ইবনু হুমাইদ (হাফি.)**। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক ও 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর গবেষণা সহকারী **শায়খ আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আছীলা। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার কাবীরা।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নাই, যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তিনি রাজাধিরাজ। তিনি মহাপবিত্র। তিনি শান্তি। তিনি বিশ্বাসী। তিনি সর্বনিয়ন্তা। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমতাধর, অহংকারী। তিনি নিখুঁত স্রষ্টা ও রূপদানকারী। সুন্দর নামসমূহ ও অনন্য দৃষ্টান্তসমূহ তাঁরই জন্য। তিনি সত্য বলেন। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা, ইমাম, আদর্শ ও নয়নের মণি নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। সৃষ্টিজগতের মধ্যে তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তি ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি পৌত্তলিকতার নির্মূলকারী। শান্তির ছায়াতলে একত্রকারী। তিনি তওবা ও দয়ার নবী। তিনি পরম বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। তিনি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী। তিনি আল্লাহর পথে তাঁর হুকুমে আহ্বানকারী। তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জবানীতে আহমাদ। তিনি মূসা আলাইহিস সালাম-এর তাওরাতে মুতাওয়াক্কিল নামে খ্যাত। ছিলেন না তিনি কঠিন হৃদয়ের কর্কষভাষী। বাজারে দিতেন না আড্ডা। মন্দ আচরণের বদলায় মন্দ আচরণ করতেন না; বরং মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে ঘুমন্ত হৃদয়গুলো জাগ্রত করেছেন, অন্ধ চক্ষুগুলো আলোকিত করেছেন। তার প্রতিপালক তাঁর মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে সোজা পথে পরিচালিত করার পরই তাকে মৃত্যু দিয়েছেন। তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব মানুষের মাঝে সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষকে কল্যাণের উপদেশ দিয়েছেন। সত্য প্রতিষ্ঠায় ও মিথ্যার মূলোৎপাটনে জীবনবাজি রেখে আমরণ আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। অতএব, হে আল্লাহ! আমাদের নেতা, আলোর পথের রাহবার, রাহমাতুল লিল আলামীনের উপর অগণিত, অফুরন্ত, চিরস্থায়ী রহমত এবং শান্তির ফল্গুধারা বর্ষণ করুন। যার কোনো শেষ নেই। অনুরূপ তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গি-সাথির উপর রহমত এবং শান্তি বর্ষণ করুন।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আছীলা। 'যিনি ফুরক্বান নাযিল করেছেন তাঁর বান্দার উপর, যাতে তিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেন। যাঁর জন্য আসমান ও যমীনের রাজত্ব। যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে যার কোনো অংশীদার নাই। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করে ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেছেন' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/১-২)*। তিনি আপনাদের উপর ছিয়াম ফরয করেছেন যেন আপনারা মুত্তাক্বী হতে পারেন। নিজ অনুগ্রহে আপনাদেরকে কল্যাণের মাসে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনাদের জন্য রহমতের ঝরনা বইয়ে দিয়েছেন। সহজসাধ্য করেছেন আনুগত্যের কাজকে এবং কুরআন নাযিল করেছেন যেন আপনারা রহমতপ্রাপ্ত হন। ধারাবাহিকভাবে তিনি আপনাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যা তিনি আপনাদের প্রতিদান দিবসে দেখাবেন। তিনি বলেন,

﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

'আর যেন তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ কর যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যখন আমার কোনো বান্দা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন তাদের বলে দিন), নিশ্চয় আমি তার অতি নিকটে আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়, আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫-১৮৬)*।

(আল্লাহু আকবার...) **হে বিশ্বাসীগণ!** আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে খরচ করুন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! আমার দেওয়া রিযিক থেকে খরচ করো ঐ দিন আসার পূর্বেই, যেদিনে কোনো ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং কারো সুপারিশ চলবে না' *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৪)*। **আর জেনে রাখুন, আল্লাহর রাসূল** ﷺ **যাকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর বা যব কিংবা দেশের প্রধান খাদ্যদ্রব্য এক ছা' পরিমাণ ফরয করেছেন** প্রত্যেক স্বাধীন, গোলাম, নারী, পুরুষ, ছোট ও বড় মুসলিমের উপর যারা ঈদের রাত পাবে এবং যার নিকটে তার এবং তার পরিবারের একদিনের খাবারের অতিরিক্ত খাবার মজুদ আছে। এটা করা হয়েছে ছিয়াম পালনকারীকে অনর্থক কথা, কর্ম ও অশ্লীলতার গুনাহ থেকে পবিত্রকরণার্থে এবং মিসকীন-অসহায়, হতদরিদ্রদের খাদ্যদানের নিমিত্তে। অতএব, যে ব্যক্তি তা ঈদের ছালাতের পূর্বে আদায় করবে, সেটা হবে গ্রহণযোগ্য যাকাতুল ফিতর। আর যে তা ছালাতের পরে আদায় করবে, সেটা হবে সাধারণ দান। মুসলিমের জন্য যাকাতুল ফিতর বের করা জরুরী।

(আল্লাহু আকবার...) **আল্লাহর বান্দাগণ!** জেনে রাখুন, আমলের গ্রহেণযোগ্যতা ও পূর্ণতা পুরোপুরি নির্ভর করে নিয়্যতের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়্যত করেছে। আমলের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড হলো সেটাই যার বাতলিয়েছেন নবী মুহাম্মাদ ﷺ। জেনে রাখুন, আপনাদের ধর্মের স্বরূপ হলো- বাহ্যিক আত্মসমর্পন, অভ্যন্তরীন বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা। আর শেষোক্ত এই নিষ্ঠাই হলো দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া। নিষ্ঠা (ইহসান) বলতে বুঝায় 'এমনভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন আল্লাহকে তুমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ। যদি মনের মধ্যে এমন ভাব সৃষ্টি না হয়, তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।

(আল্লাহু আকবার...) **আল্লাহর বান্দাগণ!** জেনে রাখুন, দ্বীন মানে হলো স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকারগুলো আদায় করা। আর ইসলাম গ্রহণ করলেই মানুষের জীবন সুরক্ষিত হয়ে গেল। তার হিসাব-নিকাশ হবে আল্লাহর কাছে। মনে রাখুন! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না।

(আল্লাহু আকবার...) **হে মুসলিম জাতি!** সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলো বর্জন করুন। রাগ থেকে বিরত থাকুন। ইহকালে কিংবা পরকালে উপকারে আসবে না এমন কথা ও কর্ম পরিহার করুন। সর্বক্ষেত্রে নিষ্ঠার পরিচয় দিন এবং যেখানেই থাকুন আল্লাহকে ভয় করুন।

(আল্লাহু আকবার...) **আল্লাহর বান্দাগণ!** আপনারা আল্লাহকে স্মরণ রাখুন, তিনিও আপনাদের স্মরণ রাখবেন। তাঁর কাছে দু'আ করুন, তিনি দু'আ কবুল করবেন। মহাক্ষমতাধর সুমহান রবের কাছে সাহায্য চান। জেনে রাখুন, দুনিয়ার সব দুর্ঘটনা পূর্বনির্ধারিত। আর ধৈর্যের পর আসে সাহায্য। বিপদের পরই মুক্তি আসে। কষ্টের পরে সুখ আসে। আর যে ব্যক্তি যা মন চাই তাই করে, তার মধ্য লজ্জার 'ল'ও থাকে না।

(আল্লাহু আকবার...) **হে বিশ্বাসীগণ!** ইসলামে ঐ লোকই সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে ঈমানের উপর অটল থাকে। নিজকে অপকর্ম থেকে পবিত্র রাখে এবং আল্লাহকে স্মরণে রাখে। ছালাত আদায় করে, দান-ছাদাক্বা করে এবং ধৈর্যধারণ করে। কুরআন তেলাওয়াত করে, কুরআন মেনে চলে এবং কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে। এভাবে সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করে, আমলের পাল্লা নেকী দিয়ে ভরে তোলে এবং দলীল ক্বায়েম করে। নিজের অন্তরকে আলোকিত করে, চলার পথ আলোকিত করে, নিজকে মুক্ত করে এবং তার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে। এগুলো কিন্তু অতি সামান্যই কাজ, কিন্তু প্রতিদান তার অনেক বড়। সেই সাথে সুস্পষ্ট সুন্নাতসমূহের উপর আমল করুন। বিদআত থেকে বেঁচে থাকুন। জেনে রাখুন! কিন্তু জাহান্নামের নাটাই হলো জিহ্বার কর্ম। তাই সকলেই ভাই ভাই হয়ে যান।

(আল্লাহু আকবার...) **আল্লাহর বান্দা!** জেনে রাখো, বেলায়াতের বার্তা হলো আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া এবং মহান সত্তার দৃষ্টিতে থাকা। অতএব তুমি আল্লাহর প্রিয় হওয়ার জন্য প্রয়োজনে দেশত্যাগ করো, তাহলেই তুমি আল্লাহর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলো এবং দ্বীন মেনে চলো। পাশাপাশি 'দ্বীনের উপর অটল থাকা'টাই কারামতের মূল। পথ চলুন সহনশীল আল্লাহর দিকে। জেনে রাখো, হাদীছে কুদুসীতে মহান আল্লাহ বলেন,

«يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

'হে বনী আদম! যদি তুমি আমাকে ডাক এবং আমার কাছে ক্ষমার আশা কর, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব

তোমার থেকে যত গুনাহ হোক না কেন, এতে আমি কারো পরওয়া করি না। হে বনী আদম! তোমার গুনাহ যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। বনী আদম! তুমি যদি শিরক না করে যমীনপূর্ণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও, তাহলে আমি তোমার কাছে যমীনপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব'।[১]

(আল্লাহু আকবার...) আপনারা আপনাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চান, তাঁর কাছে তওবা করুন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক চরম দয়ালু, পরম বন্ধু।

দ্বিতীয় খুৎবা

(আল্লাহু আকবার...) **হে ঈমানদারগণ!** 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গি হও' *(আত-তাওবা, ৯/১১৯)*। আপনারা সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। যার কাছে শরীআতের বিধান পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে সে যেন তা ভালোভাবে আঁকড়ে ধরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে ভিজে থাকে'।

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা ঐ মহামানবের উপর দরূদ পাঠ করুন যার সম্মানে গাছ ছুটে এসেছিল, যার হস্তদ্বয়ে কঙ্কর তাসবীহ পাঠ করেছিল, যাকে সালাম জানিয়েছিল পাথর, যার হাতের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, যার বক্তব্যে খেজুর গাছের গুঁড়ি হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল, যাকে আল্লাহ আসমান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছিলেন, যার অন্তর পবিত্র করেছেন, যাকে তিনি তাঁর পছন্দনীয় ক্বিবলার দিকে নিযুক্ত করেছেন। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করে ভূষিত হয়েছেন। অতএব, আপনারা আল্লাহর আদেশ পালন করে আলোকিত হোন, ফেরেশেতাদের সাজে সজ্জিত হোন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ নবীর উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা দু'আ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপর রহমত এবং শান্তি বর্ষণ করো' *(আল-আহযাব, ২৫/৫৬)*। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নেতা মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমহত বর্ষণ করুন যেভাবে আপনি ইবরাহীম এবং তাঁর পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। আপনি তো প্রশংসিত, মর্যাদাবান। আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন আমাদের নেতা মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর যেভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর। আল্লাহ! আমাদের নেতা ও নবীর উপর রহমত নাযিল করুন প্রথমে, শেষে, সর্ব সময়ে, রাতে— যখন রাত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, দিনে— যখন দিন আলোকিত হয়, ইহকালে ও পরকালে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। আল্লাহ! আপানি মুসলিম জাহানের ইমাম খুলাফায়ে রাশেদা আবূ বকর, উমার, উছমান ও আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর উপর, সমস্ত ছাহাবীগণের উপর, উম্মাহাতুল মুমিনীনের উপর, নবী পরিবারের উপর এবং যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের উপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত রাজী-খুশী থাকুন। তাদের সাথে সাথে আমাদেরকেও ক্ষমা করুন। আল্লাহ! আমাদের আগে ও পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনি আমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। আপনি শুরু, আপনি শেষ। আপনি সবকিছু করতে সক্ষম। আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র। আমরা তো যালেম। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ! আপনি আমাদের দুর্বল মুসলিম ভাইদের সব জায়গায় সাহায্য করুন। আল্লাহ! বায়তুল মুক্বাদ্দাস এবং তার আশপাশে বসবাসরত আমাদের মুসলিম ভাইদের কাছে সাহায্য পাঠান। আল্লাহ! তাদের কদমগুলো যুদ্ধে অটল রাখুন, তাদের রকেট আর মিসাইলগুলো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেন। আল্লাহ! আপনি মাসজিদে আক্বছাকে অপবিত্র ইয়াহূদীদের থেকে পবিত্র করেন। আল্লাহ! আপনি দখলদার ইয়াহূদীদের পাকড়াও করুন। কারণ তারা আপনাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় এবং পরকালে কল্যাণ দান করুন। আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আছীলা।

[১]. তিরমিযী, হা/৩৫৪০, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৩৩৬।

ইজরাঈল-ফিলিস্তীন যুদ্ধ যে কারণে শুরু হলো ও থামল!

-জুয়েল রানা*

পূর্বাভাষ : ইয়াহূদীদের বর্বরতা, পাশবিকতা ও হিংস্রতায় ফিলিস্তীনের মাযলূম মুসলিমদের রক্ত ফের ঝরছে। গত ২৯ মে ২০২১, সকাল ৮ ঘটিকা পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে এই সংঘর্ষে ২৪৮ জন ফিলিস্তীনী এবং ১২ জন ইজরাঈলী নিহত হয়েছে। ফিলিস্তীনী আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। শত শত বাড়িঘর ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে, গত ২১ মে ২০২১, শুক্রবার থেকে যুদ্ধবিরতি বলবৎ হবার পর এ পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকে সেই সমঝোতা ভঙ্গের অভিযোগ ওঠেনি।

হায়! ফিলিস্তীনীরা আজ নিজ দেশে প্রবাসী। বহু বছর যাবৎ নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা পথেপ্রান্তরে দেশ হতে দেশান্তরে উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। আর তাদের যারা দেশের মাটি কামড়ে রয়েছে, তাদের উপরে চলছে ইয়াহূদীদের বর্বর নির্যাতন আর পাশবিক অত্যাচার। হত্যা-ধর্ষণ-অপহরণসহ এমন কোনো নির্যাতন নেই, যা তাদের উপরে চলছে না। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হয়— কবে শেষ হবে ফিলিস্তীনীদের ওপর এই নিষ্ঠুরতম অত্যাচার! কবে থামবে এই হত্যাযজ্ঞ! ওদের গগণবিদারী আহাজারি শোনার কি কেউ নেই? তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ কি নেই? কী ওদের অপরাধ, কী কারণে আজ ওদের এ করুণ অবস্থা? হ্যাঁ, কারণ একটাই— ওরা মুসলিম, ওরা ফিলিস্তীনী! মুসলিম না হয়ে অন্য কোনো জাতি হলে আজ হয়তো ওদেরকে এই জ্বলন্ত হুতাশনে জ্বলতে হত না। তখন ওদের উদ্ধারে এগিয়ে আসত ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান ও তাদের দোসররা।

ইয়াহূদী জাতির কলঙ্কময় ইতিহাস : ইয়াহূদীদের জাতীয় ইতিহাস হীনতা ও নীচতায় পরিপূর্ণ এক কলঙ্কময় ইতিহাস। একসময় এ জাতি ছিল আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহধন্য। সমসাময়িক জাতিগোষ্ঠির উপর আল্লাহ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। অনেক নবী ও রাসূল তাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে এরা হয়ে উঠেছিল নাফরমান ও না-শোকর। কুরআন মাজীদে তাদের জাতীয় ইতিহাসের এই দুই ধারা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। একপর্যায়ে এরা এতই উদ্ধত হয়ে উঠল যে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করল। আল্লাহর বিধানসমূহ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করল, এমনকি আল্লাহর রাসূলগণকে হত্যা করল! এই চরম না-শোকরী ও নাফরমানীর কারণে এ জাতি হয়ে গেল 'মাগযূব'— আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত। আর এরই প্রকাশ ঘটল এদের কর্ম, বিশ্বাস ও জাতীয় চরিত্রে। সংশয় ও কপটতা এদের বিশ্বাসের, শঠতা ও প্রতারণা এদের কর্মের এবং হীনতা ও হিংস্রতা এদের চরিত্রের শিরোনাম হয়ে দাঁড়ালো। আর সময় সময় এদের উপর নেমে এলো চরম শাস্তির খড়্গ। এই ধারা অতি প্রাচীন। সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে এর বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে এদের আচরণ তো সর্বজনবিদিত। অল্প কিছু মহাপ্রাণ ছাড়া যাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, এরা সর্বদা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। একাধিকবার নবী ﷺ-কে হত্যার অপচেষ্টাও তারা করেছে। কিন্তু আল্লাহ অলৌকিকভাবে তাঁর নবীকে রক্ষা করেছেন। এরপর হাজার বছর যাবৎ লাঞ্ছনা ও ভাসমান জীবনই ছিল এদের ভাগ্যলিপি। তবু এদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। সুযোগ পেলেই এরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে পশ্চিমাদের যোগসাজশে ফিলিস্তীনীদের মাতৃভূমিতে ইজরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এরা আবার নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এরা আরব মুসলিমের রক্ত ঝরিয়ে চলেছে। অথচ এরা দু'দিনও টিকতে পারত না যদি না পশ্চিমা সামরিক ও কূটনৈতিক সহায়তা এরা পেত এবং যদি না মুসলিম বিশ্বের, বিশেষকরে মধ্য প্রাচ্যের 'মুসলিম-নেতৃত্বে'র ভীরুতা ও নতজানুতা এবং স্বার্থ ও ক্ষমতার লিপ্সা এদের পথকে মসৃণ করত।

ফিলিস্তীন প্রকৃত অর্থে মুসলিমদেরই : ফিলিস্তীন কোনো অর্থেই ইয়াহূদীদের নয়; বরং ন্যায়সংগতভাবে মুসলিমদেরই যা উৎপত্তিগত ও ঐতিহাসিক-দলীল সূত্রে প্রমাণিত। ফিলিস্তীনের পূর্ব নাম 'কেনআন'। নূহ আলাইহিস সালাম-এর পঞ্চম অধস্তন পুরুষের নাম 'ফিলিস্তীন'। 'ক্রিট' ও 'এজিয়ান' সাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত ফিলিস্তীনীদের নামানুসারে এই অঞ্চল 'ফিলিস্তীন' নামে

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দিপাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

পরিচিত হয়। খ্রিষ্টানদের আগমনের বহু পূর্বেই এরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ফিলিস্তীনীরা 'আগনন' সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আরব বংশোদ্ভূত। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবূ বকর ও উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সময়ে ১৩-১৭ হিজরী সনে ফিলিস্তীন সম্পূর্ণরূপে ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়।

উৎপত্তিগত দিক থেকে ফিলিস্তীন মুসলিমদের বলেই প্রতীয়মান হয়। একইভাবে আল্লাহ প্রেরিত বিভিন্ন বাণী, নবী প্রেরণ ও মাসজিদুল আক্বছা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের কারণে এটা মুসলমানের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র স্থান, যা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। উল্লেখ্য, এই জেরুজালেম সমস্যার সমাধান যদি সেই ১৯৪৮ সালেই করা হতো তাহলে আজকের ফিলিস্তীনের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। মূলত এই দুর্দশার জন্য জাতিসংঘের বিলম্বিত, দুর্বল ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতিই দায়ী।

ইসলাম বৈরী শক্তির নীল নকশা : ইসলাম বৈরী শক্তি আজ শুধু ফিলিস্তীনী মুসলিম নয়, বরং সারা বিশ্বের মুসলিমদের কীভাবে নিধন করা যায় তার নীল নকশা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে। এজন্য তারা এক মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে অপর মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখছে, এক মুসলিমকে অপর মুসলিমের বিরুদ্ধে লাগানোর ছক তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অতঃপর সংঘাত-যুদ্ধ বাধিয়ে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছে এবং ঐ গোষ্ঠীগুলোর কাছে আবার অস্ত্র বিক্রি করছে। কখনো নির্যাতিত মুসলিমদের প্রতি কিছু লোক দেখানো মানবিক সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে তাদের নিকটতম বন্ধু হিসাবে নিজেদের উপস্থাপন করছে। ফিলিস্তীনী মুসলিমগণ আজ তাদের নিজ ভূমিতেই 'সন্ত্রাসী'! কারণ তাঁরা আপন ভূমির অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত নন! পক্ষান্তরে জবরদখলকারী ইয়াহূদী জাতিই হচ্ছে 'সন্ত্রাস' দমনকারী!

ব্রিটিশ ও আমেরিকাসহ খ্রিষ্টান বিশ্বের প্রত্যক্ষ মদদ : ইজরাঈল শুরু থেকেই ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের প্রত্যক্ষ মদদ পেয়ে আসছে। আরব-ইজরাঈল যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যরা ইজরাঈলের পক্ষে যুদ্ধ করেছে বলেও জানা গেছে। এখনো যখন ইজরাঈল ফিলিস্তীনীদেরকে হত্যা করে, নারী-শিশুদেরও হত্যা করে, ধরে নিয়ে যায় এ নিয়ে জাতিসংঘ ইজরাঈলের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব আনলে আমেরিকা ভেটো দেয়। আত্মরক্ষার অধিকারের ধোঁয়া তুলে সরাসরি ইজরাঈলকে রক্ষা করে। জাতিসংঘের আইন, আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, যুদ্ধাপরাধ আইন সব কিছুই তারা নিয়মিত লঙ্ঘন করে। কিন্তু তাতে তাদের কোনো কিছুই হয় না। কারণ তাদের আমেরিকা আছে। তারা প্রকাশ্যেই ইজরাঈলকে রক্ষা করে চলেছে, একদম নগ্নভাবে।

বেশির ভাগ পশ্চিমা দেশে ইজরাঈলীদের জন্য ভিসা ফ্রি। নামিদামি ইউনিভার্সিটিগুলোতে তারা স্কলারশিপ পায়। এর বাইরে আবার প্রায় সব বড় বড় কোম্পানির বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট আছে ইজরাঈলে। তারা তাদের শিক্ষা, গবেষণা, ট্যুরিজম ইত্যাদি খাতে ইনভেস্ট করে। অন্যদিকে ফিলিস্তীনীরা আগামীকাল পর্যন্ত তাদের বাড়িটা সংরক্ষিত থাকবে কিনা জানে না। প্রাণ থাকবে কিনা সেটাও জানে না। স্কুলটা থাকবে কিনা তাও জানে না। রাতবিরাতে এসে তল্লাশী চালিয়ে ইজরাঈলী পুলিশ যাকে তাকে ধরে নিয়ে যায় তার আর রক্ষা নেই, সে অল্পবয়সী শিশু হলেও।

ফিলিস্তীনীদের সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ ফোর্স রাখারও অনুমতি নেই। ফিলিস্তীনী সিকিউরিটি ফোর্স নামে একটা বাহিনী আছে, তাদের ভারী কোনো অস্ত্র রাখার অনুমতি নেই। ইজরাঈলের সাথে এক চুক্তিতে এটা মেনে নেয় ইয়াসির আরাফাতের পিএলও। ফলে মাহমূদ আব্বাস প্রেসিডেন্ট পদের পদাধিকারী হলেও কার্যত তার কোনো ক্ষমতা নেই। ধর্ম-বর্ণ এবং ভাষা-ভূখণ্ড নির্বিশেষে সকল কুফরী শক্তি যে এক জোট ও এক মিল্লাত, তার বড় সুস্পষ্ট উদাহরণ এসকল ঘটনা।

ইজরাঈল দখল করতে করতে ফিলিস্তীনকে এমনভাবে দখল করেছে— একপাশে গাযা উপত্যকা, অন্যপাশে পশ্চিমতীর। মাঝখানে ইজরাঈল। ব্যাপারটা অনেকটা পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মতো পশ্চিম তীর আর গাযা, মাঝখানে ভারতের মতো ইজরাঈল। মনে করার সুবিধার্তে, গাযা হচ্ছে বাংলাদেশ, পশ্চিম তীর পাকিস্তান। মাঝখানে ভারত হচ্ছে ইজরাঈল (ভৌগোলিক অবস্থান বা ম্যাপ বুঝার সুবিধার্তে বলা)।

গাযা উপত্যকায় খাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, ওষুধসহ সবকিছুই চোরাই পথে আনতে হয়। ইরান চোরাইপথে অস্ত্র আর কাতার টাকা দেয়। এর বাইরে তুরস্ক সমুদ্রসীমা আর ইজরাঈলী সীমা ব্যবহার করে জাহাজভর্তি খাবার, ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য গাযায় পৌঁছে দেয়। একবার তুরস্কের একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল ইজরাঈল। সঊদী আরবসহ

অন্যান্য আরব দেশ তাদের দানের একটা বড় অংশ ফিলিস্তীনে পাঠায়। তবে সেটা গাযায় নয়, বরং পশ্চিম তীরে যায়।

ইজরাঈল হামাসকে বারবার বলছে— তোমরা যদি আমাদের শর্ত মেনে নাও, সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করো, অস্ত্র সমর্পণ করো, নিরস্ত্র হও, তাহলে তোমাদের অবরোধ আমরা তুলে নেব। তোমরা যেখানে চাও, যেতে পারবে। আমাদের এখানে চাকরি করতে পারবে। যা কিনতে চাও, তা কিনতে পারবে। মাহমূদ আব্বাসের পিএলও পশ্চিম তীরে এই শর্ত মেনে নিলেও ইসমাঈল হানিয়া আর খালিদ মিশালের গাযা উপত্যকার হামাস সেটা মেনে নেয়নি। যার কারণে তারা অবরুদ্ধ। এই কারণে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীনীরা ইজরাঈলের দিকে ঢিল আর পাথর ছুঁড়লেও গাযা উপত্যকার ফিলিস্তীনীরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে, ইজরাঈলের দিকে মিসাইল ছুঁড়ে।

যদিও ইজরাঈলী অত্যাধুনিক ডিফেন্স সিস্টেম আইরন ডোম ফিলিস্তীনীদের এই মিসাইল আকাশে থাকতেই ধ্বংস করে। তবে এবার ইজরাঈলের আইরন ডোম হামাসের সব মিসাইল আটকে দিতে সক্ষম হয়নি। অনেকগুলো মিসাইল ইজরাঈলের বিভিন্ন শহরের রাস্তা এবং ভবনে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। এতে ইজরাঈলসহ তাদের মিত্ররা বেশ অবাক হয়েছে। আইরন ডোম কতটা আঘাত ঠেকাতে সক্ষম সেটা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে। কারণ হামাসের মিসাইলগুলো কোনো অত্যাধুনিক মিসাইল নয়। এগুলো তারা পাইপ এবং অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিসপত্র থেকে বানায়। এই হ্যান্ডমেইড রকেটগুলোর আঘাত হানার পর আইরন ডোম নিরাপত্তাদানে কতটা সক্ষম, সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

'ওয়াশিংটন পোস্ট' জানায়, গাযায় ইয়াহূদীদের তাণ্ডব চলাকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইজরাঈলের কাছে ৭৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে বারবার ভেটোক্ষমতা প্রয়োগ করে ইজরাঈলকে উদ্ধত বানিয়েছে এবং ফিলিস্তীনীদের রাখতে চায় দমিয়ে। শক্তিধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ মদদে ইজরাঈল বেপরোয়াভাবে ফিলিস্তীনে গণহত্যা চালানোর সাহস পাচ্ছে, এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

গাযার বড় বড় ভবন ধ্বংস ও মানবতার সবক : গত ১০ মে, ২০২১ বোমা বর্ষণের পর থেকে গাযার ছয়টি হাই রেইজ ভবনের সবগুলোই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। হামলায় অন্তত ১৮৪টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন ধ্বংস করা হয়েছে। আর মিডিয়ার ৩৩টি অফিস গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইজরাঈলী বিমান হামলায় আল-জাযিরা ও এপির অফিস-সংবলিত ভবন আল-জালা টাওয়ারও ধ্বংস হয়ে গেছে। ইজরাঈল সাফাই হিসাবে বলছে, এখান থেকে হামাসের সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মোহসেন আবূ রামাদান বলেন, বেসামরিক এলাকা ও অবকাঠামো ধ্বংস করা ইজরাঈলের নতুন কোনো কৌশল নয়। আগের হামলাগুলোতেও তারা কাজটি করেছে। তিনি বলেন, তবে এবার করা হয়েছে অনেক বেশি। আবূ রামাদান আরও বলেন, এসব টার্গেট সাধারণ মানুষের ওপর ভয়াবহ প্রভাব সৃষ্টি করে। ইজরাঈল মনে করছে, এই ক্ষতির ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা হামাসকে ইজরাঈলে রকেট হামলা বন্ধ করতে চাপ দেবে, হামাসের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। আর তাতেই লাভবান হবে ইজরাঈল। তবে, গাযা সিটির মেয়র ইয়াহইয়া আল-সারাজ বলেন, গাযার ভয়াবহ ক্ষতি করে ইজরাঈল চাচ্ছে আমাদের জনগণের মনোবল, দৃঢ়প্রত্যয় গুঁড়িয়ে দিতে।

এই ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন গাযা সীমান্তের চেকপোস্টগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বিদেশি সাংবাদিকদের গাযায় ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও ইজরাঈল বলছে, ঐ ভবনে হামাসের গোয়েন্দা শাখার একটি অফিস ছিল। কিন্তু এপি'র নির্বাহি সম্পাদক এই অভিযোগের ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তবে, বুঝতে বাকি নেই— সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতেই ইজরাঈলের এই নগ্ন হামলা।

আপনি চিন্তা করুন— বাক-স্বাধীনতা, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলতে বলতে যারা সর্বক্ষণ বুলি আওড়ায়, তাদেরই এক অন্তরঙ্গ রাষ্ট্র বিশ্ব-মিডিয়ার একটা অফিস গুঁড়িয়ে দিয়েছে ঘোষণা দিয়ে! কিন্তু তবুও, আপনি সেই ইজরাঈলের পক্ষেই সাফাই গাওয়া দেখবেন। তাদেরকে বিজ্ঞান-বান্ধব, উদার, গণতন্ত্রমনা, আধুনিকসহ নানান তকমা দিয়ে মহান আর গরীয়ান করে না তুললে আপনার চারপাশে থাকা সেক্যুলার-আধা সেক্যুলার-নাস্তিকদের জাত চলে যায়। এরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু ইজরাঈল-আমেরিকার পারমাণবিক শক্তিকে পূঁজো দিতে এরা সদাসর্বদা প্রস্তুত।

কথাটা সুন্দর, উপদেশটা যথার্থ নয় : কেউ কেউ বলছেন, 'মুসলিমদের জ্ঞানে-বিজ্ঞান চর্চা বাড়াতে হবে, নচেৎ কেবল

পাথর ছুঁড়ে আর দু'আ করে আমেরিকা-ইজরাঈলকে ঘায়েল করা সম্ভব না'। কথাটা সুন্দর, কিন্তু উপদেশটা যথার্থ নয়। কারণ, মুসলিমরা বিজ্ঞান চর্চা বাড়াতে না পারার পেছনে কি কেবল 'মুসলিমরাই' এককভাবে দায়ী? একটা গোষ্ঠীকে 'ওয়ার অন টেরর' তকমার আওতায় এনে কোণঠাসা করে রাখবেন, আতশবাজির মতো করে দিনরাত তাদের ঘরবাড়ির ওপরে বোমা ফেলবেন আর আশা করে থাকবেন যে তারা তাদের চোখ-মুখ ল্যাবরেটরির অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ডুবিয়ে রাখবে? সম্ভবত, জীবন এতটা সহজ আর সাবলীল নয়। আপনি বলতে পারেন, ওয়ার অন টেরর তো সেদিনের ইস্যু, এর আগে কি তবে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বজয় করেছিল? ওয়ার অন টেরর ইস্যু না হয় কাল-পরশুর, কিন্তু বিজ্ঞান, ক্ষেত্রবিশেষে শত্রুকে জবাব দেওয়ার জন্য যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সক্ষমতা দরকার, সেই সক্ষমতা অর্জনে মুসলিমদের দমিয়ে রাখার চক্রান্তটা সম্ভবত আজ-কালকের নয়, বহু পুরনো। মোসাদ কর্তৃক ফিলিস্তীন, সিরিয়া, ইরান-আফগানিস্তানের বিজ্ঞানীদের হত্যার অভিযোগটাও অনেকটা প্রতিষ্ঠিত বিষয়।

স্বীকার করছি মুসলিমদের নিজেদের উদাসীনতা, নিজেদের মধ্যকার দলাদলি-কোন্দল বিজ্ঞান চর্চায় তাদের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ, কিন্তু বিশ্ব-মোড়লদের পরোক্ষ দায়টাকেও এখানে ছোট হিসাবে দেখার সুযোগ নেই। মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশে দেশে যে অস্থিরতা, সেই অস্থিরতা টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থ হাছিল করে নেওয়া গোষ্ঠীটা কীভাবে চাইবে যে, শত্রুপক্ষ তার সমান সক্ষমতা লাভ করুক?

প্রায় চার বিলিয়ন ডলার বার্ষিক সামরিক সহায়তা, বিলিয়ন ডলারের শিক্ষা এবং রিসার্চের ইনভেস্টমেন্ট, প্রায় ভিসা ফ্রি ট্রাভেল, নামি ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ, আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপের একনিষ্ঠ মদদ এত কিছু পাওয়া ইজরাঈলের সাথে অবরুদ্ধ ফিলিস্তীনের তুলনা করার সময় আপনারা যারা 'ইজরায়েল জ্ঞান বিজ্ঞানে কত এগিয়েছে অথচ ফিলিস্তীন জ্ঞান বিজ্ঞানে আগায় নাই কেন?' বলেন, আপনাদের লজ্জা করে না?

হামাসের পাল্টা আক্রমণ ও মুসলিমদের চিন্তার দৈন্যতা : ইজরাঈলের আক্রমণের বিপরীতে হামাস এবার অন্তত কিছুটা হলেও পাল্টা আক্রমণের দিকে ঝুঁকেছে। দিন কয়েক আগে ফিলিস্তীনের রকেট হামলায় তেলআবিবসহ ইজরাঈলের অনেক শহর বেশ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়ে। আমাদের কিছু সুশীল শ্রেণির মানুষ বলছেন, এমন ধারার আক্রমণ করে ফিলিস্তীন নিজের বিপদ বড় করা ছাড়া আর কিছুই করছে না। ইজরাঈল যদি পূর্ণ শক্তি নিয়ে ফিলিস্তীন আক্রমণ করে, রাতারাতি তারা ফিলিস্তীনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। যেহেতু ইজরাঈলের সাথে লড়বার সক্ষমতা নেই, ফিলিস্তীনের উচিত নয়, এ ধরনের আক্রমণগুলোতে যাওয়া। তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, ইজরাঈলের আর্মিরা এতদিন গোলাপ ফুল, চকোলেট আর নীল খামে ভরা প্রেমপত্র নিয়ে ফিলিস্তীন সীমান্তে মধুর অপেক্ষায় থাকত আর ফিলিস্তীনীদের দেখামাত্রই ভালোবাসা নিবেদনে ব্যাকুল হয়ে পড়ত। এই প্রথম ফিলিস্তীনীদের কোনো আচরণে ইজরাঈল মনে অনেক কষ্ট পেয়েছে এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভালোবাসার মানুষটিকে কুসুম কুসুম আঘাত করছে! ইনছাফের লড়াইয়ে সবচেয়ে যেটা বেশি জরুরী সেটা হলো সাহস। রাত্রিবেলায় মৃত্যুর নিশ্চয়তা নিয়ে ঘুমাতে যাওয়া একটা জাতিকে আপনি উপদেশ দিচ্ছেন শত্রুর দিকে পাথর না ছুঁড়ে, তার গুলিকে বুকে পেতে নিতে? এটাই আপনাদের সাম্যবাদী লড়াই আর মানবতার মূল সবক?

মন্তব্য : ফিলিস্তীনে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনের রক্তক্ষরণে আমাদের হৃদয়ে কতটুকু বেদনা জাগছে তা তিনিই জানেন যিনি অন্তর্যামী। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ঘটনা-ধারা কুরআনের বর্ণনাকেই প্রতিষ্ঠিত করছে এবং আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ঈমানী চেতনায় জাগরণ, দ্বীনী পরিচয়ে ও ভ্রাতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ আমাদের সামনে নেই।

ইজরাঈলের সাথে দীর্ঘ ১১ দিনের সংঘর্ষের পর গাযায় মানবিক পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে— বলেছেন খোদ জাতিসংঘের কর্মকর্তারাই। ফিলিস্তীনে যুদ্ধ বিরতি (?)। অনেকে খুশী হয়েছেন। আমিও খুশী হয়েছি। কিন্তু যে ক্ষতিটা হলো জানমালের, সেটা কি ইজরাঈল ফেরত দিবে? দিতে পারবে? আর যুদ্ধ বিরতিই কি ইজরাঈল-ফিলিস্তীন সমস্যার শেষ সমাধান? না, কখনোই না।

স্মর্তব্য যে, মুসলিমদের ন্যায্য অধিকার অন্য কেউ আদায় করে দিবে না। মুসলিমদেরকেই তা আদায় করতে হবে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। **অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করাও এ মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী।** আল্লাহ আমাদের মাযলূম ফিলিস্তীনী ভাই-বোনদের রক্ষা করুন এবং মাসজিদুল আক্বছাকে হেফাযত করুন— আমীন!

হে আল্লাহ! আমাদের মাযলূম ভাই-বোনদের সাহায্য করুন। যালিমের যুলুম থেকে তাদের রক্ষা করুন এবং আবার আমাদের জাগিয়ে দিন। ঈমান ও আমলের যে সম্পদে ও হাতিয়ারে আমাদের পূর্বসূরীগণ সমৃদ্ধ ছিলেন, সেই সম্পদ ও হাতিয়ার আবার আমাদের দান করুন— আমীন!

কুরআনে বর্ণিত মৌমাছির জীবনচক্রের সাথে মুমিন বান্দাদের মিল

-মুমতাহিনা খাতুন*

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের নিকট কঠিন বিষয়কে সহজ ও বোধগম্য করার জন্য চমৎকার উপমার ব্যবহার করেছেন। আর সেই উপমার মাধ্যমে আমরা কঠিন বিষয় সহজ ও স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হই। পবিত্র কুরআনে মৌমাছির বর্ণনায় আন-নাহল নামে একটি সূরা নাযিল করা হয়েছে। যেখানে মৌমাছি সম্পর্কে আলোচনা অতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তেমনিভাবে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও ছাহাবীগণকে বিভিন্ন বিষয় উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন, যাতে ঈমানী শক্তি আরও সুদৃঢ় ও মযবূত হয়। হাদীছে এমন অনেক উপমা রয়েছে, যেখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, যা মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে মুমিন বান্দার জীবনের সাথে মৌমাছির জীবনচক্রের গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আজকের এই লেখায় তেমনই কিছু বিষয়ের উপমা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘ঐ সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ হলো মৌমাছির মতো, যারা উত্তম জিনিস খায়, উত্তম জিনিস তার পেট থেকে বের হয়। তারা ফুলের উপর বসে কিন্তু তা নষ্ট করে না কিংবা তা ভেঙে ফেলে না’।[১]

মৌমাছির জীবনচক্র থেকে মানবজাতি অর্থাৎ একজন মুমিন বান্দা যে সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো— (১) প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহকে মেনে চলা, (২) দলবদ্ধ তথা সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করা, (৩) সরদার অর্থাৎ নেতাকে অনুসরণ করা, (৪) উৎকৃষ্ট জিনিস আহরণ করা, (৫) কোনো কিছুর ক্ষতিসাধন না করা, (৬) সবসময় পরিশ্রম করা অর্থাৎ কর্মোদ্যমী হওয়া ও (৭) আমানতদারিতা রক্ষা করা। এছাড়াও মৌমাছির জীবনচক্র থেকে আমরা আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারি।

এই বিষয়টি এত সূক্ষ্ম আর গভীর যে, এ নিয়ে সাধারণত কোনো আলোচনা হয় না বা মানুষকে ভাবতে দেখা যায় না। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে অনেক অজানা সূক্ষ্ম বিষয়। মৌমাছি আল্লাহ তাআলার একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি, তবে এর কার্যক্রম অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুগভীর। পবিত্র কুরআনে আন-নাহল বা মৌমাছি সূরা নামে একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করে এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির উপর আলাদা গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কেন মৌমাছির উপর (এক ধরনের) অহী নাযিল করলেন? কেন উক্ত সূরায় বর্ণিত কথাগুলো বললেন? এটি মুমিন বান্দাদের জন্য ভাববার বিষয়। এই সূরাটির ৬৮ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ ‘তোমার পালনকর্তা মৌমাছির প্রতি আদেশ করেছেন যে, পর্বতের গুহায়, বৃক্ষ, উঁচু চালে গৃহ তৈরি করো’ *(আন-নাহল, ১৬/৬৮)*। এখানে মহান আল্লাহ মৌমাছিকে আদেশ করেছেন। ঠিক একইভাবে ৬৯ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾ ‘অতঃপর সর্বপ্রকার ফল থেকে আহার করো এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও’ *(আন-নাহল, ১৬/৬৯)*। এই বিষয়গুলো থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা দেখি যে, এক একটি মৌমাছি মধু সংগ্রহের জন্য অনেক দূর-দূরান্তে যায়, তথাপি তারা পথ হারায় না; তারা তাদের রবের দেখানো পথে পুনরায় ফিরে আসে। কারণ, তারা সর্বদা আল্লাহর দেখানো পথে ধাবমান, আল্লাহর দেখানো পথে হাঁটে। বিধায় কখনো পথভ্রষ্ট হয় না, নিজ গন্তব্যে ঠিকই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে মানুষও যদি তার রবের দেখানো পথে চলে, সে কখনো পথহারা হবে না। মানুষ তথা মুমিন ব্যক্তির মূল আবাসস্থান হলো জান্নাত। আদম-হাওয়াকে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল জান্নাতে। সেই জান্নাত থেকে আমরা চলে এসেছি। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে রেখেছেন। আমরা যদি তার দেখানো পথে চলি, তাহলে আমরা আমাদের বাসভবন অর্থাৎ জান্নাতে যেতে পারব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব। মৌমাছি থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি।

তারপর যে বিষয়টি মৌমাছির কাছ থেকে একজন মুমিন বান্দার শেখার আছে, তা হলো— একটি রাষ্ট্রে পরস্পর সুশৃঙ্খল ও দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করা। আমরা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, মৌমাছি যেখানে চাক বাঁধে, সেটা তাদের

* শিক্ষার্থী, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৮৭২, ‘ছহীহ’।

একটি রাষ্ট্র। অর্থাৎ এক একটি চাককে এক একটি রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই রকম এক একটা চাকে প্রায় ১২/১৫ হাজার মৌমাছি থাকে এবং পরস্পর কত সুন্দর মিলেমিশে বসবাস করে, যা সত্যিই ভাববার। আর সেই রাষ্ট্রের থাকে একজন নেতা, যার নেতৃত্বে রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয়ে থাকে। আর এই রাষ্ট্রের নেতা হলো রাণী মৌমাছিটি। এই রাণী সমস্ত মৌমাছির চেয়ে একটু আলাদা অর্থাৎ অন্যদের চেয়ে একটু বড় ও সুঠাম হয়ে থাকে। এই রাণী সবাইকে পরিচালিত করে থাকে। সকলের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে তদারকি করে থাকে। প্রথমত, যে দায়িত্বটা বণ্টন করে থাকে সেটি হলো গার্ড বা নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্ব অর্থাৎ কিছু মৌমাছি আছে যারা তাদের চাক নামক রাষ্ট্রের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রদানে ব্যস্ত থাকে। অনাকাঙ্ক্ষিত কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, ঢুকতে চাইলে সবাই মিলে তার উপর আক্রমণ করে— এটি রাণীর আদেশ। তারা রাণীর কথার বাইরে এক চুলও নড়ে না। আমরা যদি আমাদের সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাও ঠিক একইভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন- আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী এই দায়িত্বটি অতি যত্নের সাথে পরিচালনা করে থাকে আমাদের রাণী অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ অনুসারে। অনুরূপ কেউ অবৈধভাবে প্রবেশ করতে চাইলে সবাই মিলে তাকে প্রতিহত করে। এটি কিন্তু মৌমাছির কাছ থেকে পাওয়া একটি শিক্ষা।

কিছু মৌমাছি আছে যারা বাচ্চা লালনপালন করে, আমাদের মায়েদের মতো বলা চলে অনেকটা। আর কিছু মৌমাছি আছে যারা মোম সংগ্রহ করে, আবার কিছু মৌমাছি আছে যারা প্রকৌশলী অর্থাৎ বাসা নির্মাণ করে। এগুলো সবই পরিচালিত হয় রাণীর আদেশে। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, মৌমাছির বাসাগুলো এত নিপুণ আর আর্কষণীয় হয় যে, এক একটা কুঠুরির ছয়টি কোণা থাকে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, ছয়টি কোণা কেন? এই ছয়টি কোণারও একটি বিশেষত্ব রয়েছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো প্রতিটি কোণা সমানভাবে তৈরি। জ্যামিতিকভাবে হিসাব করে দেখা গেছে যে, যদি ছয়টি কোণা না থাকত তাহলে তার কিছু অংশ বাদ পড়ত এবং কোনো না কোনোভাবে তা পূর্ণ হতো না। ছয়কোণা হওয়ায় এর পরিপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে। ঠিক একইভাবে যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব যে, আমাদের দেশের প্রকৌশলীরাও এখন এই নিয়মে বাড়ি তৈরি করছে, যাতে কোনো কোণা অব্যবহৃত অবস্থায় না থাকে। এটি কিন্তু মৌমাছি থেকে প্রাপ্ত একটি শিক্ষা।

আরেকটি বিষয় হলো— যদি কোনো মৌমাছি কোনো ময়লা-আবর্জনা বা স্তূপের উপর বসার পর তার চাকে ফিরে যেতে চায়, তাহলে চাকের নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে চাকে প্রবেশ করতে দেয় না। শুধু নোংরা হওয়ার কারণে তার জন্য এত বাধ্যবাধকতা। কখনো কখনো রাণীর আদেশে তাকে মেরে ফেলা হয়। আমরা জানি 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'।[২] অনুরূপভাবে আমাদের নিজেদের, আমাদের পরিবার ও সমাজ এমনকি রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে। তাহলে গোটা দেশ পরিবর্তন হয়ে যাবে। যারা এরকম নোংরা কাজে লিপ্ত হবে, তাদের জন্য কার্যকরী আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, 'সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর আরশের নিচে আশ্রয় পাবে। তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে ন্যায় বিচারক'।[৩] আমরা মুমিন বান্দারা সমাজে কত সহজে মৌমাছির কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

পরবর্তী বিষয়টি হলো— একজন মুমিনের কেমন হওয়া উচিত আমরা এই শিক্ষাটাও কিন্তু মৌমাছির কাছ থেকে পেয়ে থাকি। মৌমাছি এমন একটি পতঙ্গ, যা মানুষের ক্ষতিসাধন করে না; কিন্তু উপকার করে। মৌমাছি ফুল থেকে নির্যাস নেয়, কিন্তু তা বিন্দুমাত্র নষ্ট করে না। একজন মুমিন ব্যক্তিকে ঠিক অনুরূপ হতে হবে। একজন মুমিন ব্যক্তি কারো ক্ষতি করবে না, বরং সর্বদা উপকারে লিপ্ত থাকবে। একজন মুমিন ব্যক্তি হবেন সর্বদা উদ্যমী ও পরিশ্রমী, যেমনটি মৌমাছি হয়ে থাকে। আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করলে তা বুঝতে পারি যে, মৌমাছি কত কষ্ট করে হাজারো মাইল পরিভ্রমণ করে মানুষের জন্য মধু সংগ্রহ করছে এবং তা বিলিয়ে দিচ্ছে আমাদের মাঝে। কৃষি গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, মৌমাছিরা যদি এক ফুল থেকে অন্য ফুলে গিয়ে মধু সংগ্রহ না করত তাহলে ফুলের পরাগায়ন হতো না। এটাও আল্লাহর একটি বিশেষ নিদর্শন। এখান থেকে সহজে বোঝা যায় যে, মৌমাছিরা কতটা পরিশ্রমী আর উপকারী পতঙ্গ। একজন মুমিন ব্যক্তিকেও তেমনই নিজে কষ্ট করে অন্যের খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। যেমনটি মহানবী ﷺ বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি কখনো অলস হয় না। মুমিন ব্যক্তি

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩; মিশকাত, হা/২৮১।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৪২৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩১।

www.al-itisam.com

কপালে ঘাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে'।[৪] অর্থাৎ একজন মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই পরিশ্রমী। আল্লাহর সৃষ্টি মৌমাছির কাছ থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— মৌমাছি সর্বদা উৎকৃষ্ট ও পরিচ্ছন্ন জিনিস খায়। এরা কিন্তু যে কোনো জায়গা থেকে মধু সংগ্রহ করে না। তারা সবসময় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে থাকে। তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত মধু অত্যন্ত পবিত্র ও স্বচ্ছ। বিষয়টি আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার যে, আল্লাহ আমাদের উপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। তেমনি আল্লাহ তাআলা পশুদের ব্যাপারে বলেছেন, ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ 'অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলোর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদের আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু' *(আন-নাহল, ১৬/৬৬)*। ঠিক একইভাবে আল্লাহ মৌমাছির মতো পতঙ্গের পেটের মধ্যে থেকে কৌশলে বের করে নিয়ে আসেন মধু। এরপরও কি মানুষ আল্লাহর উপর থেকে ঈমান হারাবে? মৌমাছির মধু যেমনটি পবিত্র ও স্বচ্ছ, তেমনি একজন মুমিন ব্যক্তির অন্তরও পবিত্র ও কলুষমুক্ত হওয়া উচিত। সেই মুমিনের পবিত্র অন্তরে সবসময় ঈমানের আলোয় পরিস্ফুটিত হতে থাকে। অনুরূপভাবে একজন মুমিনের খাদ্য ও উপার্জন সবই পবিত্র হওয়া উচিত। আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাই যে, যারা মুমিন নয়, তারা যা পায় তাই খায়। তাদের মধ্যে কোনো হালাল-হারাম, রুচি-অরুচি ও উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টের কোনো ভেদাভেদ নেই। সাময়িক সুবিধার জন্য তারা হারাম পথে পয়সা কামাতে ও হারাম খাদ্য গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যায় যে, একটি ক্ষুদ্র কীট মৌমাছি এদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট আহার করে থাকে। একজন মুমিনের মৌমাছির কাছ থেকে এই শিক্ষাটাই গ্রহণ করা উচিত যে, সর্বদা হালাল খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা হালাল খাদ্য দেহ ও মনকে পবিত্র রাখে।

এখানে মৌমাছির কাছ থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুমিন বান্দার শেখার রয়েছে। সেটি হলো— কারো ক্ষতি না করা। আমরা জানি, 'সেই প্রকৃত মুমিন যার হাত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জিহ্বা থেকে অন্য মানুষ নিরাপদে থাকে'।[৫] আমাদের আচরণও প্রকৃত মুমিনের মতো হওয়া উচিত। যেমনটি মৌমাছি শুধু ফুল ও ফলে উড়তে থাকে এবং দেখতে থাকে এখান থেকে যদি আমি মধু বা নির্যাস নিই তাহলে এটার কোনো ক্ষতি হবে কি? যদি বুঝতে পারে যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, তাহলে সেখান থেকে নির্যাস নেওয়া থেকে বিরত থাকে। আর দেখার পর যখন বুঝতে পারে যে, এখান থেকে মধু বা নির্যাস নিলে কোনো ক্ষতি হবে না, বরং পরাগায়ন হবে ও উপকার হবে তখন শুধু সেখান থেকে নির্যাস নেয়। যেখান থেকে যতটুকু নিলে ক্ষতি হবে না, সেখান থেকে শুধু ততটুকু নেয়। এটি আমাদের জন্য কত বড় শিক্ষণীয় বিষয়, তা আমরা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্ষতি করা যাবে না, ক্ষতি সহ্য করাও যাবে না'।[৬] এজন্য আমাদের সবার উচিত কারও ক্ষতি না করা, ক্ষতি সহ্যও না করা। আমাদের চেষ্টা করতে হবে সমাজ, পরিবার ও নিজেদের জানমালের যেন ক্ষতি না হয়, সেই দিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।

সর্বশেষ একজন মুমিন বান্দার মৌমাছির কাছে যে বিষয়টি শেখার আছে তা হলো— আমানতদারিতা। যেটি উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যদি আমরা এই বিষয়ে মৌমাছিদের উপর দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাই যে, তারা কী পরিমাণ বিশ্বস্ততা এবং আমানত রক্ষা করে থাকে! মৌমাছি মধু আহরণ করা থেকে চাকে পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো দায়িত্বটাই আমানতদারিতার সাথে পালন করে থাকে। তারা তাদের রাণীর আদেশ এমনভাবে পালন করে যে, এক বিন্দু মধুও তারা নষ্ট করে না বা নিজের পাকস্থলীতে জমা রাখে না। কী এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত!

একইভাবে একজন মুমিন সম্পদকে আল্লাহর আমানত মনে করে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। হারাম বা নিষিদ্ধ পথে ব্যবহার করবে না। বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেবে না। আল্লাহ তাআলা মৌমাছির বর্ণনা দিয়ে কত সুন্দরভাবে তা আমাদের বুঝিয়েছেন। অনেক সময় দেখা যায় আমরা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করি, সরকারি সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে থাকি- এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমরা আল্লাহর তৈরি এই একটি পতঙ্গ থেকে অনেক মূল্যবান কিছু শিক্ষা লাভ করলাম। তা যদি আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে থাকি, তাহলে আমরা আমাদের আসল গন্তব্যে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব ইনশা-আল্লাহ।

৪. নাসাঈ, হা/১৮২৮, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/১৬১০।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০।

৬. ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪১, হাদীছ ছহীহ।

কবিতা

কালো পাথর

-মুহাম্মাদ ইমাম হোসেন
শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

কালো পাথরে পাথর ঘসে জ্বেলে দিই আলো
এসো পাথরে পাথর ঘসে জ্বেলে দিই আলো,
কেটে যাক অমানিশা আঁধারের কালো
কেটে যাবে অমানিশা আঁধারের কালো।
যে পাথরে গড়া মিশরের পিরামিড
ভারতের তাজমহল চীনের প্রাচীর,
তার চেয়ে দামি মানো কি না তুমি
আবাবিল ছুড়েছিল নুড়ি শত শত।
যে পাথরে সেজে ওঠে রাজার মুকুট
ধনাগার ভরে যায় অঢেল প্রচুর,
তার চেয়ে বেশি দামি মানো কি না তুমি
ফিলিস্তীনের শিশু ছোড়ে অবিরত।

জান্নাতী স্বপ্ন

-ফারজানা ইয়াসমিন
শিক্ষার্থী, সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ,
সাতক্ষীরা।

আমি হারিয়ে যেতে চাই
ঐ ঘন সবুজ অরণ্যে,
যার তলদেশে থাকবে
নির্মলধারার প্রস্রবণ,
যার স্বচ্ছ চাঁদির পরশে
অনাদিকাল সিক্ত হবে মন।
ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষে
ফলগুলো থাকবে নুয়ে,
যা হবে খুব নিকটে।
আমি বসে থাকব
হেলান দিয়ে কিনারায়,
রেশমের আস্তর-বিশিষ্ট বিছানায়
আরো রবে স্বর্ণখচিত সিংহাসন
পরস্পর মুখোমুখি হেলান দিয়ে,
চির কিশোরের আনাগোনায়
খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালায়।
যা পানে হবে না শিরঃপীড়া
হবে না বিকারগ্রস্ত আনমনা।
যেখানে শুনতে হবে না কখনো
কোনো অবান্তর, খারাপ কথা
হবে না মনঃপীড়া অযথা।
কিন্তু শুনতে পাব মধুর সুরে
সালাম আর সালাম,
যা আমার উত্তম প্রতিদান।

ফ্রি ফায়ার

-মো. জহুরুল
হরিপুর, পোরশা, নওগাঁ।

যুবক ছেলেটি হাতে ধরে মোবাইল খেলছে তো খেলছেই
স্বাভাবিক কাজকর্মে তার কোনো চেতনা নেই।
পাবজি আর ফ্রি ফায়ারের নেশায় সে আছে ডুবে
আহার, নিদ্রার গুরুত্ব নেই তার অনুভবে।
সময়ের মূল্য নেই, এতটা ভাবার সময় নেই
বড় ফোন আর এমবি খরচ প্রতিদিন লাগবেই।
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কোনো দায়বদ্ধতা নেই
অনলাইন জগতের অপরাধ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই।
পঙ্গু হয়ে গেল যুবসমাজ, নৈতিক মূল্যবোধের বড় অভাব
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে লাখো মানবসম্পদ।
গেমের খরচ জোগাতে না পেরে করে আত্মহত্যা
ধর্মচর্চার সুযোগ নেই, নেই কোনো শিক্ষা।
শারীরিক ও মানসিক হাজারো সমস্যা পড়াশোনায় মনোযোগ নেই
এরকম চলতে থাকলে জাতি ধ্বংস হবেই।

ঈদের খুশি

-আশরাফুল হক
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

ঈদের খুশি সবার মাঝে
দাও ছড়িয়ে,
দরিদ্র আর অসহায়দের
নাও জড়িয়ে।
উঁচু নিচু এই ভেদাভেদ
যাও ভুলে যাও,
বঞ্চিতদর বুকের মাঝে
নাও তুলে নাও।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশের ৫৯ লাখ শিক্ষার্থী শিক্ষা ঝুঁকিতে

মহামারির কারণে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় দেশের ৫৯ লাখ ২০ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থী ন্যূনতম শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (PPRC) এবং ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (BIGD) যৌথ গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। সমীক্ষার ফলাফলে বলা হয়েছে, ৫১ শতাংশ প্রাথমিক ও ৬১ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী পড়াশোনার ক্ষতি এড়াতে কোচিং ও গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এতে বলা হয়, মহামারিতে শিক্ষার ব্যয় গ্রামীণ পরিবারে ১১ গুণ ও শহুরে পরিবারে ১৩ গুণ বেড়েছে। করোনার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রায় এক বছর দুই মাস বন্ধ থাকায় প্রাথমিক স্তরের শতকরা ১৯ ভাগ ও মাধ্যমিক স্তরের ২৫ ভাগ শিক্ষার্থী শিখন ঘাটতিতে রয়েছে। শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে। যেসব শিশু সমাজের দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত, তাদের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন। অনেক দিন ধরে বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষায় ঘাটতি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, মানসিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসহ দীর্ঘমেয়াদি নানা ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিক ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা কমে যাবে এবং ঝরে পড়ার হার বাড়বে। শহরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ঘাটতির ঝুঁকি বেশি। ছাত্রীদের ২৬ ভাগ এবং ছাত্রদের ৩০ ভাগ এই ঝুঁকিতে রয়েছে। অতি দরিদ্র পরিবারের মাধ্যমিক স্কুলগামী ৩৩ ভাগ ছাত্রের কোভিডে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ধাক্কায় স্কুল ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলাফলে আরও দেখা গেছে, দূরবর্তী শিক্ষণের জন্য যে সুবিধা থাকা দরকার তা আছে বা ব্যবহার করছে ১০ ভাগ শিক্ষার্থী। ফলে সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে এই বন্ধে লেখাপড়া শেখার হার খুব কম। স্কুলগামী ছেলেশিশুদের ৮ ভাগ এবং মেয়েশিশুদের ৩ ভাগ কোনো না কোনো উপার্জন প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ ও মুছল্লীদের সংখ্যা বাড়ছে

ধারাবাহিকভাবেই মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'দি অ্যামেরিকান মস্ক ২০২০ : গ্রোয়িং অ্যান্ড ইভোলভিং' (যুক্তরাষ্ট্রের মসজিদ ২০২০ : বৃদ্ধি ও বিকাশ) শীর্ষক এক জরিপ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা ছিল দুই হাজার একশ ছয়টি। ২০২০ সালে এই সংখ্যা ৩১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার সাতশ ৬৯টি। ২০২০ সালের এ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শুক্রবারে জুমআর ছালাতে প্রতি মসজিদে গড়ে ৪১০ মুছল্লী উপস্থিত থাকেন। ২০১০ সালে এই উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩৫৩ জন। এই হিসাব অনুসারে মুছল্লীদের উপস্থিতি বেড়েছে ১৬ শতাংশ। চার ভাগের তিন ভাগ মসজিদে (৭২ শতাংশ) জুমআর ছালাতে মুছল্লীদের উপস্থিতি বেড়েছে ১০ শতাংশের বেশি। ২০১০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, আমেরিকার শতকরা ১৭ ভাগ মসজিদ বিভিন্ন শহরে অবস্থিত। ২০২০ সালের এ সমীক্ষায় বিভিন্ন বড় শহরের আফ্রিকান মসজিদের সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ কমে যায়। অপরদিকে শহরতলি ও গ্রামে নতুন মসজিদ বৃদ্ধি পায়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মসজিদের সংখ্যা বাড়লেও আগের তুলনায় ইসলাম গ্রহণের হার ৩১ শতাংশ কমেছে। ২০১০ সালে মসজিদে ইসলাম গ্রহণের হার ছিল ১৫.৩। ২০২০ সালে ইসলাম গ্রহণের হার কমে ১১.৩ দেখা যায়।

মুসলিম বিশ্ব

গাজায় ইসরাঈলী আগ্রাসন

সম্প্রতি ইসরাঈল-ফিলিস্তীনের সংঘাতের সূত্রপাত মূলত গত ১৩ এপ্রিল। পবিত্র রামাযান মাসের প্রথম রাতে জেরুজালেমে দামেস্ক গেট বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় সেদিন পূর্ব জেরুজালেমে ইসরাঈলী পুলিশের সঙ্গে ফিলিস্তীনী বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। এরপর থেকেই উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ উত্তেজনা চরমে পৌঁছায় পূর্ব জেরুজালেমের শেখ জাররাহ এলাকায় কয়েকটি ফিলিস্তীনী পরিবারকে উৎখাতের মাধ্যমে। ২ মে শেখ জাররাহ এলাকায় ইসরাঈলী পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের কয়েক দফায় সংঘর্ষ হয়। উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ জাররাহ এলাকায় ফিলিস্তীনী পরিবারগুলোকে উৎখাতের বিষয়ে ইসরাঈলের সুপ্রিম কোর্ট ৯ মে শুনানি পিছিয়ে দেন। তবে এতে উত্তেজনা থামেনি। ১০ মে পবিত্র আল-আক্বছা মসজিদ প্রাঙ্গণে পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এরপর হামাস রকেট হামলা চালালে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন থেকে বিমান হামলা শুরু করে ইসরাঈলী বাহিনী। হামাসও পাল্টা জবাব দিতে থাকে। ইসরাঈল-

ফিলিস্তীনের মধ্যে এই সংঘাতকে বলা হচ্ছে ২০১৪ সালের পর সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘাত। ২০১৪ সালের ওই সংঘাতে ২২৫১ ফিলিস্তীনী নিহত হন। ইসরাঈলের পক্ষে প্রাণহানি ছিল ৭৪, যাদের অধিকাংশই সেনাসদস্য। এবারের সংঘাতে পশ্চিমাদের মদদে আর মুসলিম বিশ্বের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় রক্তের নেশায় মেতে উঠেছিল ইসরাঈলী হানাদার বাহিনী সেই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ২৬০ জনের লাশ পেয়েই অবশেষে খ্যান্ত দিলেন। অবশেষে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলো ইসরাঈল এবং হামাস। রক্তাক্ত গাজা ভূখণ্ডে শেষ হলো ইসরাঈলের ১১ দিনের ধ্বংসযজ্ঞ। গাজা ভূখণ্ডে প্রায় দুই হাজার হাউজিং ইউনিট, ৭৪টি সরকারি ভবন, ৩টি মজসিদ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরাঈলী বাহিনী। এছাড়াও ১৬৮০০ হাউজিং ইউনিট, ৬৬টি স্কুল, ৪০টি মসজিদ আংশিক ধসে গেছে তাদের বোমার আঘাতে। সেখানকার পুলিশ হেড কোয়ার্টারও ধ্বংস হয়ে গেছে। ১৩ তলাবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক মিডিয়া ভবনটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট সেবাদানকারী বহুতল ভবনটি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে ইসরাঈলী হায়েনারা। গাজা ভূখণ্ডে বিশাল এলাকা পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে এক লাখ ২০ হাজার মানুষ। অন্যদিকে ২৫৯ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। যাদের ৬৫ জন শিশু, ৩৯ জন নারী এবং ১৭ জন বয়স্ক মানুষ। সমূলে শেষ করে দেওয়া হয়েছে বহু পরিবারকে। আট হাজার লোক আহত হয়েছেন। হাসপাতালগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বোমা খুঁজে দেবে মৌমাছি

সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকা কুকুর যেভাবে গন্ধ শুঁকে বোমা অনুসন্ধান করতে পারে, ঠিক সেভাবেই মৌমাছিরাও নিজেদের শক্তিশালী ঘ্রাণশক্তি ব্যবহার করে বোমা খুঁজে বের করতে পারে। প্রাণীজগতের অন্যতম ছোট পতঙ্গ মৌমাছি। তবে এদের ঘ্রাণশক্তি এতটাই শক্তিশালী যে, প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার দূর থেকে টিএনটি বা ট্রাইনাইট্রোটলুইন শনাক্ত করতে পারে। মৌমাছির ১৭০টির মতো ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতাই কাজে লাগিয়েছে ক্রোয়েশিয়ার বিজ্ঞানীরা। নব্বইয়ের দশকে ঘটে যাওয়া বসনিয়ার যুদ্ধে লুকিয়ে রাখা ল্যান্ডমাইন শনাক্তে মৌমাছি কতটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিয়ে রীতিমতো হৈচৈ ফেলে দিয়েছে গবেষকদলটি। ক্রোয়েশিয়ার এই গবেষকদল দীর্ঘদিন ধরে মাইন শনাক্ত করার জন্য মৌমাছিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করে আসছে। আর তাদের চেষ্টা বর্তমানে দেখেছে আলোর মুখ। কিন্তু সব কিছুরই সীমাবদ্ধতা আছে। কয়েকশ বা কয়েক হাজার মৌমাছিকে মাইন শনাক্তের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব, কিন্তু লাখ লাখ মৌমাছিকে কীভাবে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যায়? মূলত মাইন শনাক্তকরণে প্রশিক্ষিত মৌমাছি নিজেরাই প্রাকৃতিকভাবে অন্য মৌমাছিদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এসব প্রশিক্ষিত মৌমাছিদের এখন বলা হচ্ছে 'প্রাকৃতিক সেনাবাহিনী'। এই প্রাকৃতিক সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মানব সেনাবাহিনীর মতো করেই। মৌমাছিদের প্রশিক্ষণের সময় তাদের খাবারের সঙ্গে খুব কম পরিমাণ টিএনটি বা ট্রাইনাইট্রোটলুইন মিশিয়ে দেওয়া হয়। ট্রাইনাইট্রোটলুইন হলুদ বর্ণের এক ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ, যা মূলত ল্যান্ডমাইন, হ্যান্ড গ্রেনেড ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এর অণুতে অক্সিজেনের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি থাকায় সামান্য আঘাতেই এটির অভ্যন্তরে দহন বিক্রিয়া ঘটে এবং বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। দীর্ঘদিন ট্রাইনাইট্রোটলুইন মেশানো খাবার গ্রহণের কারণে ট্রাইনাইট্রোটলুইনের গন্ধকেই খাবারের গন্ধ হিসাবে ধরে নেয় মৌমাছি। আর যেখানে এর গন্ধ পায়, সেখানেই ঘুর ঘুর করতে থাকে। মৌমাছি যখন ট্রাইনাইট্রোটলুইনের গন্ধের সঙ্গে খাবারের গন্ধ মিলিয়ে ফেলে তখনই ধরে নেওয়া হয় মৌমাছিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সফল হয়েছে। এরপর মৌমাছিদের ছেড়ে দেওয়া হয় সম্ভাব্য মাইন থাকতে পারে এ রকম এলাকায়। খাবারের সঙ্গে ট্রাইনাইট্রোটলুইন মিশিয়ে দেওয়ার কারণে মৌমাছি যখন পরবর্তী সময়ে সেসব এলাকায় খাবারের অনুসন্ধান করা শুরু করে, তখন ট্রাইনাইট্রোটলুইনের গন্ধের দিকে বেশি নজর থাকে তাদের। এমনিতেই মৌমাছি যেকোনো গন্ধের প্রতি প্রচণ্ড সংবেদনশীল হয়। ল্যান্ডমাইন যেহেতু ট্রাইনাইট্রোটলুইন রাসায়নিক ব্যবহার করে বানানো, ফলে মৌমাছির এই সংবেদনশীলতার কারণে ল্যান্ডমাইনের আশপাশে খাবারের খোঁজ করতে থাকে, যা পর্যবেক্ষণ করে একটি ড্রোন। ড্রোনের পাঠানো ছবির সাহায্য আর গাণিতিক এলগারিদম দুটির সমন্বয়ে মাইনের অবস্থান শনাক্ত করেন বিজ্ঞানীরা। আর এই পদ্ধতিতে তারা প্রায় ৮০ শতাংশের ওপরে সফল। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন মৌমাছি আর ড্রোনের মিলিত চেষ্টায় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় থাকা সক্রিয় স্থলবোমাগুলো দ্রুত নিষ্ক্রিয় করা যাবে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের আমল ও ফযীলত

প্রশ্ন (১) : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব ও ফযীলত কী?

-নাজিউর রহমান
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের নেক আমল মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং এর ফযীলত জিহাদের চেয়েও বেশি। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, '(বাছরের) যে কোনো দিনের সৎ আমলের চেয়ে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল মহান আল্লাহর নিকটে অধিকতর প্রিয়'। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও কি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও। তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে তার জানমাল নিয়ে জিহাদে বের হয়েছে এবং কোনো একটিও নিয়ে ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে)' (আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৮; তিরমিযী, হ/৭৫৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭; মিশকাত, হা/১৪৬০, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (২) : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ঠিক কয়টা ছিয়াম পালন করতে হবে?

-মনছুর আহমাদ
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অধিক ফযীলতপূর্ণ বলে ছিয়াম কিংবা অন্যান্য নেকীর কাজ করা যেতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৯; মিশকাত, হা/১৪৬০)। সে হিসাব ১ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায়। কেননা আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত ছিয়াম রাখতেন (নাসাঈ, হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ)। তবে আরাফার দিনের ছিয়ামের মর্যাদা আলাদা। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি আরাফার দিনের ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাআলা তার এক বছর আগের এবং এক বছর পরের ছগীরা গুনাহ মাফ করে দিবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪)। উল্লেখ্য যে, মা আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বর্ণিত ছহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যিলহজ্জের প্রথম দশকে কোনো ছিয়াম পালন করতে দেখিনি' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৮১-২৭৮২)। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ইমাম নববী বলেন, সফর বা অন্য কোনো কারণে হয়তো আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) এটা দেখেননি। তবে এর দ্বারা এ সময় ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না (ঐ, ব্যাখ্যা দ্র.)।

প্রশ্ন (৩) : যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর কুরবানীদাতার জন্য নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি কাটা উচিত নয়। এই বিধান কি পরিবারের সকল সদস্যের উপর প্রযোজ্য হয়?

-সাব্বির হোসেন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এ বিধান পরিবারের সবার উপর প্রযোজ্য নয়; বরং তা শুধু কুরবানীদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যখন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে, আর তোমাদের কেউ যদি কুরবানী করার মনস্থ করে, তাহলে সে যেন চুল কিংবা নখ না কাটে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭; মিশকাত, হা/১৪৫৯)। হাদীছে উল্লিখিত বিষয়টি শুধু কুরবানীদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরিবারের সকলের জন্য নয়। কাজেই পরিবারের অন্য সদস্যগণ এসব থেকে বিরত থাকলেও কোনো ছওয়াবের অধিকারী হবে না। সাথে সাথে কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তি নেকীর আশায় নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকলে নেকী পাবেন মর্মের কথাটি ঠিক নয়। বরং এমর্মের হাদীছটি যঈফ (যঈফ আল-জামিউছ ছাগীর, হা/১২৬৫; সুনান নাসাঈ, হা/৪৩৬৫; আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৯; মিশকাত, হা/১৪৭৯)।

প্রশ্ন (৪) : যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর কুরবানীদাতা নখ, চুল কাটলে পাপ হবে কি?

-আক্কাস আলী
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : হ্যাঁ, যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর কুরবানীদাতা নখ, চুল কাটলে পাপ হবে (শরহে নববী, ১৩/১৩৮; মাআলেমুস সুনান, ২/২২৭)। কারণ এটা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ। উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর হতে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হতে বিরত থাকে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৫; মিশকাত, হা/১৪৫৯)। তবে কোনো কুরবানীদাতা ভুলবশত বা অজ্ঞতার কারণে তা কেটে থাকলে পাপী হবেন না। কিন্তু নেকী থেকে বঞ্চিত হবেন। আর যদি ইচ্ছাপূর্বক তা করেন তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

আরাফার ছিয়াম

প্রশ্ন (৫) : প্রতি বছর আরাফার দিন (৯ যিলহজ্জ) ছিয়াম রাখা সুন্নাত। কিন্তু বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী সাধারণত ৮ যিলহজ্জ তারিখে আরাফা হয়। এক্ষণে করণীয় কী?

-ছিফাত
গাবতলী বগুড়া।

উত্তর : আরাফার ছিয়াম পালন করতে হয় যেদিন হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থান করেন। আর সেটা হয় যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে। সুতরাং যেদিন যে দেশে ৯ যিলহজ্জ হবে সেদিন সে দেশে আরাফার ছিয়াম পালন করবে, সঊদীর সাথে মিল রেখে নয় (ফাতাওয়া ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফতওয়া নং ৪০৭২০; ইসলাম ওয়েব, ফতওয়া নং ২২৭৯৫৩)। কারণ ছিয়াম ও ঈদের বিধান চাঁদ দেখার সাথে সম্পর্কিত, স্থানের সাথে নয় (ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮০; মিশকাত, হা/১৯৭০)। আর এটাই দলীলের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। তবে সঊদী আরবের আরাফার দিনে ছিয়াম রাখার পক্ষে শায়খ বিন বাযসহ কয়েকজন বিদ্বানের ফতওয়া আছে। বিধায় কেউ চাইলে সঊদী আরবের সাথে মিল রেখেও আরাফার ছিয়াম রাখতে পারে। -(ওয়াল্লাহু আ'লাম)

কুরবানীর ইতিহাস

প্রশ্ন (৬) : কখন থেকে কুরবানীর প্রচলন শুরু হয়?

-আবুল বাশার
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। পৃথিবীর ইতিহাসে আদম আলাইহিস সালাম-এর পুত্রদ্বয় হাবীল ও ক্বাবীলের কুরবানী করার মাধ্যমে যার সূচনা হয় (আল-মায়েদা, ৫/২৭)। তবে বর্তমানে আমরা যে কুরবানীর সাথে পরিচিত তা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আদর্শ হিসাবে অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় (আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০০-১১১)। দ্বিতীয় হিজরীতে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে যার পুনঃপ্রচলন শুরু হয় (সুবুলুস সালাম, ২/৭০)।

প্রশ্ন (৭) : কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন রাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন পুত্রকে কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন, তখন ইবলীস মনে মনে হাজেরা (আ.)-কে বিপথে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এসে বলল, তুমি কি জানো, তোমার স্বামী ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? হাজেরা (আ.) বললেন, কেন? পাহাড়ে খড়ি কাটতে যাচ্ছে। শয়তান বলল, আল্লাহর কসম! তোমার স্বামী তার রবের নির্দেশে ইসমাঈলকে কুরবানী করতে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে হাজেরা (আ.) বললেন, যদি তার রবই তাকে এ নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে আমিও তাকে সহযোগিতা করব।

হাজেরা (আ.)-এর নিকট হতে নিরাশ হয়ে শয়তান ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পিছন পিছন চলা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে বিপথগামী করতে চাইল। কিন্তু মায়ের মতো ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও একই উত্তর দিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করে ভালো মানুষের রূপ ধরে শয়তান স্বয়ং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে গিয়ে বলল, আল্লাহর কসম! আমি জানি শয়তানই আপনাকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইলমে নববী দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, এ ব্যক্তি শয়তান ছাড়া আর কেউ না। তাই তিনি শয়তানকে বললেন, হে অভিশপ্ত! তুই দূর হয়ে যা। এতে শয়তান রাগান্বিত হয়ে পিছু হটল। উক্ত ঘটনা কি ঠিক?

-মুশফিকুর রহমান
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনাটি মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ছহীহ সূত্রে ও নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে এর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং এমন অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা বিশ্বাস করা ও তা প্রচার করা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী কর্তব্য।

প্রশ্ন (৮) : ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে যবেহ করার সময় তার চোখ, মুখ বেঁধে রাখা হয়েছিল কি?

-সাঈদুর রহমান
সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে যবেহ করার সময় তার চোখ, মুখ বাঁধা হয়েছিল, হাত-পা বাঁধা হয়েছিল, গলায় ছুরি চালানোর সময় গলায় লোহার স্পাত রাখা হয়েছিল এসব কথার কোনো ছহীহ ভিত্তি নেই। তবে যবেহের সময় ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সাদা কাপড় পরিহিত ছিলেন এবং পিতাকে কাপড় খুলে ফেলতে বলেন যাতে তা কাফন হিসাবে ব্যবহার করতে পারে (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭০৭)।

প্রশ্ন (৯) : সমাজে প্রচলিত আছে যে, 'কাবিল তার সুন্দরী বোনকে বিবাহ করতে না পারায় হিংসার বশবর্তী হয়ে হাবীলকে হত্যা করেছিল'। এ ঘটনা কি ঠিক?

-মুশফিকুর রহমান
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : না, সমাজে প্রচলিত উক্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণ বানাওয়াট, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মূলত হাবীল-কাবীলের দ্বন্দ্বটি ছিল কুরবানী কবুল হওয়া ও না হওয়া নিয়ে। বোনকে বিবাহ করা

নিয়ে নয়। এমর্মে দু'টি ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) মেষপালক সন্তানটি সাদা শিংওয়ালা প্রশস্ত চোখবিশিষ্ট একটি মেষ কুরবানী করেন। আর জমি চাষকারী সন্তানটি এক স্তুপ খাদ্য কুরবানী করেন। আল্লাহ মেষটি কবুল করেন এবং তাকে জান্নাতে ৪০ বছর লালনপালন করেন। আর সেটি সেই মেষ যা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সন্তানের বিনিময়ে কুরবানী করেন (তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আল-মায়েদা, ২০-২৭ আয়াতের তাফসীর দ্র.)। (২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দু'সন্তান কুরবানী করেছিল। তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল অপরজনের কুরবানী কবুল হয়নি। দু'জনের একজন ছিল চাষী অপরজন ছিল মেষপালক। মেষপালক তার অতীব প্রিয় সুন্দর মোটাতাজা উত্তম মেষ কুরবানী করেছিল। অপরজন গমের চেয়ে ছোট খুব নিম্নমানের এক শ্রেণির শস্য কুরবানী করেছিল। আল্লাহ মেষপালকের কুরবানী কবুল করেছিলেন। আর চাষীর কুরবানী কবুল করেননি (তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আল-মায়েদা, ২০-২৭ আয়াতের তাফসীর দ্র.)।

প্রশ্ন (১০) : আমাদের কুরবানী কোন নবীর সুন্নাত?

-মামুন
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তর : আমাদের কুরবানী ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাত। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে পুত্র কুরবানী করতে বলে তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন (আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৬)। তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পশু কুরবানী করতে বলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ 'আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। আর আমি তাঁকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখলাম' (আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৭-১০৮)। পরবর্তীতে 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন। অতঃপর অবিরত ধারায় মুসলিম উম্মাহর সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি চালু আছে। এটি কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত (মিরআতুল মাফাতীহ, ৫/৭১, ৭৩)।

কুরবানীর পশু

প্রশ্ন (১১) : কুরবানীর নিয়্যতে ক্রয়কৃত পশু ত্রুটিযুক্ত হলে সেই পশু দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

-আহমাদ
কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সুস্থ পশু যদি রোগাক্রান্ত কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে উক্ত পশু দিয়ে কুরবানী করতে শারঈ কোনো বাধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তার কাছে হজ্জের কুরবানীর পশুসমূহের মধ্যে একটি কানা পশু নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি বললেন, যদি পশুটি তোমাদের কেনার পরে কানা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তা কুরবানীতে চালিয়ে দাও। আর যদি তোমাদের কেনার আগে থেকেই কানা হয়ে থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য একটি কুরবানী দাও' (বায়হাক্বী, সুনানে ছুগরা, হা/১৭৭৪)। ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ (আল-মাজমূ', ৮/৩৬৩)।

প্রশ্ন (১২) : কুরবানীর পশুর বয়স কত বছর হলে কুরবানী করা যায়? পশুর দুধের দাঁত পড়ার পর নতুন দাঁত উঠা কি শর্ত?

-মুস্তাকীম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : শরীআতে কুরবানীর পশুর বয়সের কথা বলা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবেহ করো না (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩; মিশকাত, হা/১৪৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/১৩৭১, ৩/২২২)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠা শর্ত। তবে এমন পশু পাওয়া না গেলে যে সকল পশুর বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে তা দ্বারাও কুরবানী করা যায়।

প্রশ্ন (১৩) : কুরবানীর চাঁদ উঠলে না কি কোনো পশু যবেহ করা যায় না। তাহলে এ সময়ে জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করতে হলে করণীয় কী?

- আব্দুস সালাম
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : কুরবানীর চাঁদ উঠলে কোনো পশু যবেহ করা যায় না— এ কথাটি ঠিক নয়। কুরবানীর চাঁদ উঠার পরও হালাল পশু যবেহ করা যায়। এতে শরীআতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং জন্মের সপ্তম দিন ঈদের দিন হলেও আক্বীক্বা দেওয়া যাবে। তবে কুরবানীদাতার জন্য নখ ও চুল কাটা নিষেধ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭; মিশকাত, হা/১৪৫৯)।

কুরবানীর ফযীলত

প্রশ্ন (১৪) : ক্বিয়ামতের মাঠে কুরবানীর পশুর লোম, শিং ও খুর উপস্থিত হবে। একথা কি ঠিক?

-ছিবগাতুল্লাহ
আত্রাই, নওগাঁ।

www.al-itisam.com

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (যঈফ তিরমিযী, হা/১৪৯৩; মিশকাত, হা/১৪৭০; সিলসিলা যঈফা, হা/৫২৬, ২/১৪; যঈফ তারগীব, হা/৬৭১, ১/১৭০)। এছাড়া উক্ত হাদীছ কুরআনের আয়াতের বিরোধী। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর নিকটে কুরবানীর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া তাঁর নিকট পৌঁছে' (আল-হজ্জ, ২২/৩৭)।

প্রশ্ন (১৫) : কুরবানীর পশুর প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-শামীম হোসেন
নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৭; মিশকাত, হা/১৪৭৬)। এই সানাদে আয়িযুল্লাহ নামে একজন দুর্বল ও নাফে' আবূ দাঊদ নামে একজন পরিত্যাজ্য রাবী রয়েছে (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭২৩০ ও ৩১৩৩)।

প্রশ্ন (১৬) : কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ ও মাদরাসায় দেওয়া যাবে কি?

-আবূ তাহের
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তর : ওশর, যাকাত ও কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদে দেওয়া যাবে না। কারণ সূরা আত-তওবার ৬০ আয়াতে যাকাতের যে ৮টি খাত উল্লেখ করা হয়েছে, মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মাদরাসা 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত হিসাবে চামড়া ও যাকাত-ওশরের টাকা সেখানে প্রদান করা যায় (ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃ. ৪৪২, ফতওয়া নং ৩৮৬; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ১৮/২৫২-২৫৩)।

একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা

প্রশ্ন (১৭) : কুরবানী ও আক্বীক্বার মধ্যে পার্থক্য কী?

-মামুন
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তর : কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অন্যতম মাধ্যম (আল-কাওছার, ১০৮/২; আল-হজ্জ, ২২/৩৭)। এর গোশত মানুষ নিজে খাবে এবং ফকীর-মিসকীনকে দিতে বাধ্য (আল-হজ্জ, ২২/৩৬)। পক্ষান্তরে আক্বীকা পিতার উপরে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা জন্মের সপ্তম দিনে করতে হয় (আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৭; নাসাঈ, হা/৪২২০; মিশকাত, হা/৪১৫৩)। এর গোশত ফকীর-মিসকীনকে দিতে বাধ্য নয়। বরং তা নিজে খাবে। আর ইচ্ছা করলে আত্মীয়-স্বজন ও ফকীর-মিসকীনকে দিবে।

প্রশ্ন (১৮) : একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা করা যাবে কি?

-এহসানুল হক
পলিখাঁপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : না, একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা করা যাবে না। এটা শরীআতের সাথে প্রতারণা। রাসূল ﷺ বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না (নায়লুল আওত্বার, ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মিরআত, ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)। কুরবানী ও আক্বীক্বা দুটি পৃথক বিষয়। পৃথকভাবেই তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

কুরবানীর গোশত বণ্টন

প্রশ্ন (১৯) : কুরবানীর গোশত সমানভাবে তিন ভাগে ভাগ করা কি জরুরী? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মিলন হুসাইন
রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : কুরবানীর গোশত সমানভাবে তিন ভাগে ভাগ করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তা নিজে খাবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, '...তা হতে তোমরা নিজেরা খাও এবং হতদরিদ্রদের খাওয়াও' (আল-হজ্জ, ২২/২৮)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, '...তোমরা তা থেকে খাও এবং মিসকীন ও ফক্বীরকে খাওয়াও' (আল-হজ্জ, ২২/৩৬)। রাসূল ﷺ প্রথমদিকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত জমা রাখতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে জমা রাখার অনুমতি দেওয়া হলে ছাহাবীগণ বললেন, আপনি তো তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন? তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'গ্রাম থেকে অনেক অভাবী লোক আসার কারণে আমি সেই বছরে নিষেধ করেছিলাম। এখন যেহেতু সেই পরিস্থিতি নেই, অতএব তোমরা খাও, জমা রাখ এবং দান করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭১)। পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ে নিজে খাওয়া এবং দুই শ্রেণির মানুষকে খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। আর হাদীছে পরিস্থিতি অনুযায়ী দান করতে বলা হয়েছে। অতএব, এলাকায় অভাবী লোকের সংখ্যা বেশি হলে নিজে খাওয়ার তুলনায় দান করতে হবে বেশি। আর অভাবীর সংখ্যা কম হলে নিজের ইচ্ছামতো খাওয়া বা দান করা যেতে পারে। তবে তিন ভাগ করলে মানুষ গোনাহগার হবে বিষয়টি এমন নয়।

প্রশ্ন (২০) : প্রতিবেশীকে কুরবানীর গরুর গোশত দিয়ে সমপরিমাণ অথবা কম কিংবা বেশি করে ছাগলের গোশত নেওয়া যাবে কি?

-ছিদ্দীক্ব
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর : এরূপ পরিমাণভিত্তিক লেনদেনের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কোনো আমল পাওয়া যায় না। তাই কুরবানীর গোশতের ক্ষেত্রে এই ধরনের লেনদেন করা উচিত নয়। তবে প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনের নিকট থেকে হাদিয়াস্বরূপ কিছু নেওয়া এবং তাদেরকে কিছু দেওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘হাদিয়া দাও, মহব্বত বাড়বে’ (আল আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৯৪; মিশকাত, হা/৪৬৯৩)। অন্য হাদীছে এসেছে, ‘রাসূল ﷺ হাদিয়া নিতেন এবং তার বদলা দিতেন’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫; মিশকাত, হা/১৮২৬)।

প্রশ্ন (২১) : কুরবানীর পশু যবেহকারীকে পারিশ্রমিক হিসাবে গোশত দেওয়া যাবে কি?

-রকীবুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানীর গোশত থেকে কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু দেওয়া যাবে না। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাকে তার কুরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে, এদের গোশত, চামড়া ও পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে এবং তা হতে কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু না দিতে নির্দেশ দেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৭১৭)। তবে যবেহকারী কুরবানীর গোশত পাওয়ার হক্বদার হলে হক্বদার হিসাবে কিছু দেওয়া যেতে পারে (মুগনী, ১১/১০)। তবে তাকে তার পারিশ্রমিক দিতে হবে (ইবনু মাজাহ, হা/২৪৪৩; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৪৯৮; মিশকাত, হা/২৯৮৭)।

প্রশ্ন (২২) : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা কুরবানী করেনি, তাদেরকে গোশত দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল হামীদ
তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। কেননা সামর্থ্য থাকলেই কুরবানী করা জরুরী নয়। বরং কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কোনো সময় কেউ ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে না। আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো কুরবানী করেননি (ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৪/১৭৭)। আবূ মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেছেন, ‘সামর্থ্য থাকার পরও আমি কুরবানী দিই না এই আশঙ্কায় যে, আমার প্রতিবেশীগণ হয়ত মনে করবে কুরবানী দেওয়া আমার জন্য জরুরী’ (ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৫৫)। তাই তাদেরকে হাদিয়াস্বরূপ কুরবানীর গোশত দেওয়াতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৩) : টাকা ধার নিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল আলিম
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানী আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। বছরে মাত্র এ

কবার কুরবানী দেওয়ার সুযোগ আসে। তাই যথাসাধ্য কুরবানী দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ঋণ করা ব্যতীত কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে এবং মাসিক বেতন কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে অল্প সময়ে ঋণ পরিশোধ করার উপায় থাকলে ঋণ করে কুরবানী করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই (মাজমূউল ফাতাওয়া লি-ইবনে তায়মিয়া, ২৬/৩০৫; ফাতাওয়া বিন বায, ১/৩৭)।

কুরবানী ও ভাগা কুরবানী

প্রশ্ন (২৪) : কুরবানী করার সময় কোন দু‘আ পড়তে হবে?

- আব্দুস সামাদ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : কুরবানী করার সময় বলবে, بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ‘বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৬)। এর সাথে ‘আল্ল-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী’ও বলা যাবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ, পৃ. ৩৫)। তাছাড়া ‘আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলি বায়তী’ দু‘আও পড়া যায় (ইবনু মাজাহ, হা/৩১৪৭)।

প্রশ্ন (২৫) : পরিবারের তিন ছেলেই বাইরে থাকে। ঈদে বাড়িতে এসে ঈদ করে। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদে সকল ছেলেকে পৃথক পৃথক কুরবানী দিতে হবে, না-কি সবার পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলেই চলবে?

- আব্দুর রহমান
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় স্ব স্ব পরিবারের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক কুরবানী দেয়াই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী’ (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; তিরমিযী, হা/১৫১৮; নাসাঈ, হা/৪২২৪; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৫; মিশকাত হা/১৪৭৮)। ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সত্য কথা এই যে, একটি বকরী একটি পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতাধিক হয় এবং এভাবেই নিয়ম চলে আসছে (নায়লুল আওত্বার, ৬/২৪৪)।

তবে পিতা যদি সবার থেকে টাকা নিয়ে নিজে কুরবানী দেন এবং সবাই সেখানে থাকে ও খায় তাতে কোনো শারঈ বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৬) : একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতটি পশু কুরবানী করতে পারে?

-তানভীরুল ইসলাম
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানীই যথেষ্ট। তবে সামর্থ্য অনুপাতে একাধিক পশু কুরবানী করতে পারে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিংওয়ালা সাদা-কালো রঙের দু'টি ভেড়া কুরবানী করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৪, ৫৫৬৫)। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একসাথে ১০০টি উট কুরবানী করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭৪)।

প্রশ্ন (২৭) : পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী দিয়ে গোশত খাওয়ার আশায় গরুর ভাগায় অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-রফীক আহমাদ
সাতমাথা, বগুড়া।

উত্তর : গোশত খাওয়ার আশায় এই পদ্ধতিতে কুরবানী দেওয়া যাবে না। কেননা ইখলাছে ত্রুটি থাকলে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না (আল-বাইয়েনা, ৯৮/৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪)। স্মর্তব্য, পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করলেই কুরবানীর হক্ব আদায় হয়ে যায়। তো একটি কুরবানীর মাধ্যমে তা আদায় হয়ে গেছে। এখন ভাগে কুরবানীর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যেহেতু বিদ্বানদের মাঝে ভিন্নমত রয়েছে, তাই ভাগে কুরবানী দিতে চাইলে সেক্ষেত্রে গোশত খাওয়ার নিয়্যত না করে বরং কুরবানীরই নিয়্যত করবে।

প্রশ্ন (২৮) : হাদীছে সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানী না দিলে তাকে ঈদের মাঠে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই এমন ব্যক্তি যদি কুরবানী না দেন তাহলে কি তিনি ঈদগাহে ছালাত আদায় করতে যেতে পারবেন?

-নূর আলম
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : সামর্থ্য থাকলে কুরবানী করা জরুরী বিধানটি এমন নয়। সুতরাং সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানী না দিলেও সে যেমন পাপী হবে না; তেমনি তার ঈদগাহে যাওয়া ও ছালাত আদায় করায় শারঈ কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হলেও তা ফরয নয়। আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো কুরবানী করতেন না (ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৪/১৭৭)। উল্লেখ্য যে, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না দেওয়া ব্যক্তিকে ঈদের মাঠে যেতে নিষেধ করা হয়েছে' মর্মে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে (ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে', হা/৬৪৯০)। সাথে সাথে আবূ বকর, উমার ও আবূ মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) সহ আরও অনেক ছাহাবী মাঝেমধ্যে কুরবানী না দেওয়ার কারণে কি ঈদের মাঠে যেতেন না? অবশ্যই যেতেন। তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তি বিনা ওযরে কুরবানী না দিলেও ঈদের মাঠে ছালাত আদায়ের জন্য যাবে।

প্রশ্ন (২৯) : কুরবানীর জন্য একটি পশুতে সর্বোচ্চ কত জন অংশগ্রহণ করতে পারে?

-রাকিব হাসান
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : একটি পশুতে একাধিক জনের অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে হাদীছগুলো এসেছে, সেগুলো প্রায় সবগুলোই সফরের সাথে সম্পর্কিত। তবুও সেখানে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে ভাগে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ নেই, বরং সাত জনের কথা উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে একটি উট ও গরুতে সাত জন পর্যন্ত শরীক হতে পারে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উট সাত জনের পক্ষ থেকে' (আবূ দাঊদ, হা/২৮০৮; তিরমিযী, হা/৯০৪; মিশকাত, হা/১৪৫৮)। তবে উটে দশ জনও শরীক হওয়া যায় (ইবনু মাজাহ, হা/৩১৩১, সনদ ছহীহ)। উল্লেখ্য যে, হাদীছগুলোতে সফরের কথা উল্লেখ থাকলেও হাদীছগুলোর আমল সফরের সাথে খাছ নয়। সফরে হোক আর মুক্বীম অবস্থায় হোক গরুতে সাত জন ও উটে দশ জন অংশগ্রহণ করতে পারে। অবশ্য সাত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করার স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানী হওয়াই ভালো। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হে লোক সকল! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানী ও আতীরা দেওয়া আবশ্যক' (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; মিশকাত, হা/১৪৭৮)। অবশ্য আতীরা কথাটুকু মানসূখ হয়ে গেছে (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮)। আত্বা ইবনু ইয়া সার বলেন, আমি আবূ আইয়ূব আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কীভাবে কুরবানী হতো? তিনি বললেন, একজনে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করত। সেটা থেকে তারা খেত

এবং মানুষকে খাওয়াতো। অতঃপর মানুষ গর্ব করা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছে, তা তুমি দেখতেই পাচ্ছ' (তিরমিযী, হা/১৫০৫)।

প্রশ্ন (৩০) : ঈদের ছালাতের পরে ও খুৎবার পূর্বে কুরবানী করা যাবে কি?

-মিলন হুসাইন
রহমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ঈদের ছালাতের পরে খুৎবা দেওয়া যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত তেমনি খুৎবা শোনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ছালাত শেষে যখন মুছল্লীদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন তখন মুছল্লীগণ নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন, অছিয়ত করতেন এবং বিভিন্ন কাজের আদেশ দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; মিশকাত, হা/১৪২৬)। খুৎবা শেষ হলে ছাহাবীগণ কুরবানী করতেন। তাই খুৎবার পরেই কুরবানী করতে হবে। তবে জরুরী কোনো কারণে ঈদের ছালাতের পরে ও খুৎবার পূর্বে কুরবানী করলে কোনো সমস্যা নেই। কেননা খুৎবা না শুনে চলে যাওয়ার অনুমতি আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু সাইব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক ঈদের ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। ছালাত আদায়ের পর তিনি বলেন, 'আমরা ঈদের ছালাত পূর্ণ করেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে খুৎবা শ্রবণের জন্য বসে যাবে আর যার ইচ্ছা সে চলে যেতে পারে' (ইবনু মাজাহ, ১/৩৮৭, হা/১০৭৩-১৩০৬, 'ঈদের ছালাতের পর খুৎবার জন্য অপেক্ষা করা' অনুচ্ছেদ)। তবে ছালাতের পূর্বে কিংবা ছালাত চলাকালীন সময়ে কুরবানী করলে সেটি কুরবানী হবে না। বরং তাকে আরেকটি কুরবানী করতে হবে। (ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৫, ৫৫০০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬০; মিশকাত, হা/১৪৭২)।

মৃত ব্যক্তির কুরবানী

প্রশ্ন (৩১) : মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুছ ছামাদ
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামে পৃথক কুরবানী দেওয়া শরীআতসম্মত নয়। কেননা তা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা, কর্ম বা সম্মতি কোনোটির দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশাতেই ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) ছাড়া তার সকল সন্তান, দুই স্ত্রী খাদীজা ও যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) এবং চাচা হামযা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) প্রমুখ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অথচ তিনি তাদের কারও পক্ষ থেকেই কুরবানী করেননি। তাছাড়া রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় কোনো ছাহাবী কাছের কিংবা দূরের কোনো মৃতের নামে কুরবানী করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না (মাজমূ' ফাতাওয়া শায়খ উছায়মীন, ১৭/২৬৭)। কোনো কোনো বিদ্বান জায়েযের পক্ষে ফতওয়া দিলেও তার পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলীল উল্লেখ করেননি।

প্রশ্ন (৩২) : কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পূর্বে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার অছিয়ত করে গেলে তার অছিয়ত পূর্ণ করার বিধান কী?

-আব্দুল আহাদ
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : অছিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন (আন-নিসা, ৪/৭৯)। তাই মৃত ব্যক্তি কুরবানীর করার অছিয়ত করে গেলে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করতে হবে। তবে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ থেকে কুরবানী করতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৮)।

ঈদুল আযহার দিনের আমল

প্রশ্ন (৩৩) : একই ইমাম ঈদের জামাআতে একাধিক বার ইমামতি করতে পারে কি? ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে এরূপ কোনো আমল আছে কি?

-মীযানুর রহমান
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : একই ইমাম একই ঈদের ছালাত একাধিক বার পড়িয়েছেন মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার ছাহাবীগণের কোনো আমল পাওয়া যায় না। তবে একই ছালাত একাধিকবার পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত। মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে এশার ছালাত পড়তেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে গিয়ে আবার তাদের ইমামতি করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫; মিশকাত, হা/১১৫০)। এক্ষণে ইমামের অভাবে যদি এরূপ করতে হয়, তাহলে তা শরীআতে জায়েয হবে।

প্রশ্ন (৩৪) : ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ছওম থাকা ও কুরবানীর কলিজা দ্বারা ইফতারী করা কি সুন্নাত?

-মিলন হুসাইন
রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদুল ফিতরে খেয়ে ঈদের মাঠে যাওয়া এবং ঈদুল আযহাতে ঈদের মাঠ থেকে এসে খাওয়া সুন্নাত (তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬; মিশকাত, হা/১৪৪০)। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় কুরবানীর গোশত হতে খেতেন (আহমাদ, হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার, ৪/২৪১)।

অপর বর্ণনায় আছে, '...তিনি ঈদুল আযহার দিন খেতেন না (পশু) যবেহ না করা পর্যন্ত' (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৪২৬; বায়হাক্বী, হা/৫৯৫৪; ছহীহুল জামে', হা/৪৮৪৫, সনদ ছহীহ)। অবশ্য কুরবানীর গোশত দিয়ে খাওয়া উত্তম। বিদায় হজ্জের দিন তিনি ১০০টি উটের প্রতিটি থেকে একটু করে অংশ নিয়ে এক পাত্রে রান্না করে সেখান থেকে গোশত খেয়েছিলেন ও ঝোল পান করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০৯; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭৪; মিশকাত, হা/২৫৫৫)। তবে কলিজা খাওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছটি দুর্বল (সুবুলুস সালাম, ১/৪২৮; তা'লীক্ব আলবানী, ২/২০০)। উল্লেখ্য যে, ঈদুল আযহার দিন না খেয়ে থাকাকে ছওম বলা এবং ঈদগাহ থেকে এসে খাওয়াকে ইফতারী বলার কোনো প্রমাণ শরীআতে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৩৫) : ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালনে শারঈ নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-মিলন হুসাইন
রহমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকের দিনগুলোতে ছিয়াম রাখা জায়েয নয়। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯১; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৭; মিশকাত, হা/২০৪৮)। নুবায়শা আল-হুযালী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তাশরীকের দিনগুলো (ঈদুল আযহার পরের তিন দিন) খানাপিনা ও তাকবীর পাঠ করার দিন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪১; মিশকাত, হা/২৬৪৫)।

প্রশ্ন (৩৬) : ঈদের দিনে কবর যিয়ারত করা যাবে কি?

-আব্দুর রহীম
পবা, রাজশাহী।

উত্তর : কবর যিযারত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তবে কবর যিযারত করার জন্য জুমআ ও দুই ঈদের দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বিদআত হবে। কেননা এই দুই দিনে খাছ করে দু'আ করার পক্ষে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যা শরীআতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। তবে যেকোনো দিনে, যেকোনো সময়ে কবর যিয়ারত করা যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৫৫; মিশকাত, হা/১৭৬৭)।

প্রশ্ন (৩৭) : 'ঈদ মোবারাক' বলা যাবে কি?

-এহসানুল হক
পলিখাঁপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : 'ঈদ মোবারক' বলার পক্ষে কোনো ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। তবে ঈদের দিনে ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পর সাক্ষাতে বলতেন, 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা' অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ থেকে কবুল করুন! (ফাতহুল বারী, ৩/৫৬৭, হা/৯৫১-এর আলোচনা, সনদ হাসান; তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪-৫৫)।

প্রশ্ন (৩৮) : দুই ঈদের তাকবীর কোন সময় থেকে কখন পর্যন্ত পড়তে হয়?

-নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়া হতে ঈদের ছালাত পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত (নায়লুল আওত্বার, ৩/৩৪০; শারহুস সুন্নাহ, ৪/৩০০)। আর ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে যিলহজ্জের ৯ তারিখ তথা আরাফার দিন সকাল হতে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৫৬৭৮, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫৩-এর আলোচনা দ্র., ৩/১২৫)। তবে যিলহজ্জের প্রথম দিন হতে কুরবানীর পরের তিন দিন পর্যন্তও তাকবীর পাঠ করা যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৯-এর অনুচ্ছেদ দ্র.)।

প্রশ্ন (৩৯) : লকডাউনের জন্য ছহীহ আক্বীদার ঈদগাহে যেতে পারছি না। এমতাবস্থায় ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায়কারী ইমামের সাথে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আব্দুস সামী
গংগাচড়া, রংপুর।

উত্তর : এমন ইমামের সাথে ঈদের ছালাত জায়েয হবে। তবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত না পড়ানোর কারণে ইমাম দোষী হবেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে প্রথম রাকআতে সাতটি ও শেষ রাকআতে পাঁচটিসহ মোট বারোটি তাকবীর দিতেন (আবূ দাঊদ হা/১১৫১, ১১৫০, সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৮)। তাই যেখানে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় করা হয়, সেখানে যাওয়া উচিত।

হজ্জ ও উমরা

প্রশ্ন (৪০) : হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে দাওয়াত দিয়ে খানাপিনার অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-আব্দুর রহীম
পলাশপোল, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হজ্জে যাওয়ার পূর্বে ও হজ্জ থেকে এসে খানাপিনার অনুষ্ঠান করার শারঈ কোনো বিধান নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক সফর থেকে ফিরে এসে খানাপিনার অনুষ্ঠান করেছিলেন (বুখারী হা/৩০৮৯; মিশকাত হা/৩৯০৫)। যেহেতু হজ্জ সফরও একটি সফর সেহেতু কেউ চাইলে হজ্জ থেকে ফিরে এসে খানাপিনার অনুষ্ঠান করতে পারে। তবে তা জরুরী নয়।

প্রশ্ন (৪১) : ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) প্রথমে কাকে লক্ষ্য করে পাথর মেরেছিলেন? পাথর মারার জন্য তিনটি জামরা কেন হলো?

-হাসিবুল ইসলাম

শান্তাহার, বগুড়া।

উত্তর : ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তিন বার অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বার শয়তানকে লক্ষ্য করেই পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যখন কুরবানীর উদ্দেশ্যে মিনার দিকে বের হলেন তখন জামরাতুল আক্বাবায় শয়তানকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি শয়তানকে লক্ষ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন যার ফলে শয়তান মাটিতে গেড়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় জামরায় আবার শয়তান প্রকাশ পেল, তিনি তাকে আবারো সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এমনকি শয়তান মাটিতে গেড়ে গেল। অতঃপর তৃতীয় জামরায় শয়তান আবার প্রকাশ পেল, তিনি সেখানে আবারো তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, 'তোমরা শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করছ আর তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসরণ করছ' (মুসতাদরাকে হাকেম, হা/১৭১৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১১৫৬)। উক্ত হাদীছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) শয়তানকে লক্ষ্য করেই তিন বার পাথর নিক্ষেপ করেছেন।

তাছাড়া উক্ত হাদীছ আরও প্রমাণ করে যে, হজ্জ পালন করার সময় তিন স্থানে (জামরায়) পাথর নিক্ষেপ মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ যা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য অনুসরণীয় হিসাবে স্বীকৃত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, خذوا عني مناسككم অর্থাৎ 'তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের পদ্ধতি গ্রহণ করো (সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/৯৭৯৬)।

প্রশ্ন (৪২) : কোনো ব্যক্তি হজ্জে যাওয়ার পূর্বে ওয়ারিছদের মাঝে সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে অছিয়ত করতে পারবে কি?

-মনিরুল ইসলাম

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : মূলত মালিকের মৃত্যুর পরেই সম্পদ বণ্টন হবে। তবে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনবোধে অংশহারে সম্পদ বণ্টনের অছিয়ত করতে পারে। সাথে সাথে সামাজিক কোনো বিষয়েও অছিয়ত করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অছিয়ত করতে চায় তার জন্য যরূরী হলো, দু'রাত পার না হওয়ার পূর্বেই সে অছিয়তনামা লিখে নিজের কাছে রেখে দিবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭; মিশকাত, হা/৩০৭০)।

প্রশ্ন (৪৩) : আর্থিক সামর্থ্য আছে কিন্তু হজ্জে যেতে অক্ষম এমন ব্যক্তি কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ কাওছার

শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হ্যাঁ, এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা যাবে। আবূ রাযীন উক্বায়লী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা করতে সক্ষম নয় এবং বাহনে বসতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরা করো' (তিরমিযী, হা/৯৩০; আবূ দাঊদ, হা/১৮১০; নাসাঈ, হা/২৬২১; মিশকাত, হা/২৫২৮)। তবে হজ্জ আদায়কারীকে নিজের হজ্জ পূর্বে আদায় করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আমি শুবরোমার পক্ষ হতে হজ্জের নিয়্যত করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'শুবরোমা কে? সে বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি নিজের হজ্জ করেছো? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ করো অতঃপর শুবরোমার হজ্জ করবে' (মুসনাদুশ শাফেঈ, হা/১০০০; আবূ দাঊদ, হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ, হা/২৯০৩)। তবে এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে শুধু উমরা করা যাবে না এবং এক হজ্জের সাথে একাধিক উমরাও করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪৪) : কেউ বদলী হজ্জ করলে নিজের জন্য দু'আ করতে পারবে কি? তাছাড়া তিনি কি পূর্ণ হজ্জের নেকী পাবেন?

-আব্দুর রাজ্জাক

হিমছড়ি, সিলেট।

উত্তর : বদলী হজ্জ সম্পাদনকারী নিজের জন্য এমনকি সকল মুসলিমের জন্যও দু'আ করতে পারবে। কেননা হজ্জের জন্য দু'আর বিষয়টি ব্যাপক। সাফওয়ান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে এসে আবূ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বাড়িতে গেলাম। কিন্তু সেখানে আবূ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে পেলাম না বরং পেলাম উম্মু দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে। উম্মু দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, আপনি কি এ বছর হজ্জ পালনের ইচ্ছা করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তাহলে আমাদের মঙ্গলের জন্য দু'আ করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তির দু'আ তার ভাইয়ের জন্য অবশ্যই কবুল করা হয়ে থাকে, যা তার অনুপস্থিতিতে করা হয়। তার মাথার পাশেই একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য

দু'আ করে তখনই নিযুক্ত ফেরেশতা বলে 'আমীন' এবং বলে তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ হোক (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৩)। তবে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ-উমরা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার পক্ষে নিয়্যত করে বাহ্যিক ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত কর্মসমূহ আদায় করা (আবূ দাঊদ, হা/১৮১১; মিশকাত, হা/২৫২৯)। বদলী হজ্জ সম্পাদনকারীও পূর্ণ হজ্জের নেকী পাবেন (ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়েমা, ১১/৭৮)।

প্রশ্ন (৪৫) : মাহরাম ছাড়া কোনো মহিলা কাফেলার অন্যান্য প্রতিবেশী মহিলাদের সাথে মিলে পূর্ণ পর্দা সহকারে হজ্জ করতে পারে কি?

-ফারহান ইবনে আমিন

কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর : মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের জন্য হজ্জ-উমরাসহ যে কোনো ধরনের সফর করা বৈধ নয়। কারণ মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য মাহরাম শর্ত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মহিলা মাহরাম ব্যতীত এক দিনের সফর করবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬২, ৩০০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮২৭, ১৩৩৮; মিশকাত, হা/২৫১৫ ও ২৫১৩)। সুতরাং হজ্জের সফরে স্বামী অথবা মাহরাম থাকা জরুরী। মাহরাম ছাড়া হজ্জ ফরয হবে না।

প্রশ্ন (৪৬) : 'হাজারে আসওয়াদ' স্পর্শ করলে পাপ মোচন হয় কি?

-আব্দুল কাদের

শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ, 'হাজারে আসওয়াদ' স্পর্শ করলে পাপ মোচন হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ হাজারে আসওয়াদকে উঠাবেন, তখন তার দু'টি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে যা দ্বারা সে কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে' (তিরমিযী, হা/৯৬১, সনদ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৫৭৮)। তবে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণের উদ্দেশ্যে পাথরকে চুম্বন করতে হবে। সাথে সাথে বিশ্বাস রাখতে হবে যে উক্ত পাথর উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। যেমনটি উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি অবগত আছি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র। তুমি ক্ষতিও করতে পারো না, আবার উপকারও করতে পার না, যদি আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না দেখতাম যে, তিনি তোমাকে চুম্বন করছেন, তাহলে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না' (ছহীহ বুখারী, হা/১৫৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৭০)।

প্রশ্ন (৪৭) : 'হাজারে আসওয়াদ' সাদা ছিল। কিন্তু আদম সন্তানের পাপের কারণে তা কালো হয়েছে' একথা সঠিক কি?

-মাহফূয

বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, একথা সঠিক। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাজারে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়, তখন দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে' (তিরমিযী, হা/৭৮৮; মিশকাত, হা/২৫৭৭)।

প্রশ্ন (৪৮) : যার হজ্জ করার সামর্থ্য নেই সে যদি তার মায়ের দিকে সুনযরে তাকায়, তাহলে সে কবুল হজ্জের সমান নেকী পাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-তানভীর

মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল। এর সনদে নাহশাল ইবনু সাঈদ নামে একজন পরিচিত মিথ্যুক রাবী আছে (বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৭৮৫৬; সিলসিলা যঈফা, হা/৬২৭৩)।

প্রশ্ন (৪৯) : হজ্জ ও উমরা পালন করলে পাপ মোচন হওয়ার পাশাপাশি অভাবও দূর হয়। উল্লিখিত বক্তব্য কি ছহীহ হাদীছসম্মত?

-আব্দুস সাত্তার

পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উল্লিখিত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা হজ্জ ও উমরা আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করো। কারণ এ দু'টি দরিদ্রতা এবং পাপ উভয়ই দূর করে, যেমন হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। আর মাবরূর (কবুল) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত বৈ কিছুই নয়' (তিরমিযী, হা/৮১০, ১/১৬৭; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২৫১২; নাসাঈ, হা/২৬৩১, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (৫০) : হজ্জ থেকে বাড়ি ফেরার পর তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলা কিংবা বাড়ি থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। এমনিভাবে গরু-খাসী যবেহ করে দাওয়াত খাওয়ানো কিংবা বাজারে কিছু কিনতে গেলে একদরে ক্রয় করা উচিত মর্মে সমাজে প্রচলিত আমলগুলো কি শরীআতসম্মত?

-ইসরাঈল

শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : এগুলো সব কুসংস্কার। ইসলামে এগুলোর কোনো স্থান নেই। বরং হজ্জ অথবা কোনো সফর থেকে ফিরে

আসলে প্রথমে মসজিদে দুই রাকআত ছালাত আদায়ের পর মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় কুশলাদি বিনিময় করে বাড়িতে প্রবেশ করা সুন্নাত। কা'ব ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো সফর থেকে আসলে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকদের সাথে বসতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৮৭ ও ২৬০৪)।

তবে হজ্জ সফর থেকে ফিরে এসে দাওয়াত খাওয়ানো যায়। রাসূল a এক সফর থেকে ফিরে এসে খানাপিনার অনুষ্ঠান করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৮৯; মিশকাত, হা/৩৯০৫)। তবে হজ্জে যাওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠান করে দাওয়াত খাওয়ানোর যে প্রথা সমাজে চালু আছে তার কোনো প্রমাণ শরীআতে নেই; বরং তা বিদআত ও কুসংস্কার।

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ

(৩) জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের অবশ্যই পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য থাকতে হবে। একারণেই নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবীবর্গ হিজরতের পূর্বে মক্কায় জিহাদ করেননি, অথচ তখন তাঁদের উপর কত অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হয়েছে! বরং মহান আল্লাহ উল্টো তাঁর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ক্ষমা করে দিতে বলেছেন *(হিজর, ৮৫-৮৬; যুখরুফ, ৮৯; মায়েদা, ১৩; বুখারী, হা/৬২০৭)*। কারণ শক্তি ছাড়া যুদ্ধে নামলে উল্টো পরাজয় ও ক্ষতি নেমে আসবে। তবে শক্তি-সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা চালাতে হবে *(আনফাল, ৬০)*। **(৪)** কোন শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে নামা যাবে আর কার বিরুদ্ধে যাবে না- সে বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। **ক-** যে কাফের আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়, মানুষকে ইসলামে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, যমীনে কুফরী ছড়িয়ে বেড়ায় ও মুসলিমদের সাথে লড়াই করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। কিন্তু যারা মুসলিমদের সাথে লড়াই করে না, তাদের আক্বীদা প্রচার করে না, বরং তাদের কুফর তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে নামা যাবে না *(মুমতাহিনাহ, ৮)*। **খ-** 'মুআহাদ' (مُعَاهَدٌ) বা নিজের এলাকায় বসবাসরত কিন্তু মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো কাফেরের সাথে লড়াই করা চলবে না *(নাহল, ৯১, বুখারী, হা/৩১৬৬)*। এমনকি কোনো মুসলিম কোনো চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যা করে ফেললে কাফফারা ও দিয়াত দিতে হবে *(নিসা, ৯২)*। **গ-** সরকার বা জনগণের আশ্রিত (مُسْتَأْمِنٌ) কোনো কাফেরকে হত্যা করা যাবে না *(তাওবাহ, ৬)*। **ঘ-** জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুসলিম জনপদে বসবাসকারী মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ (يَمِيٌّ) কোনো কাফেরকে হত্যা করা যাবে না *(তাওবাহ, ২৯)*। **ঙ-** নারী ও শিশুকে হত্যা করা যাবে না *(বুখারী, হা/৩০১৪; মুসলিম, হা/১৭৪৪)*। এসব বিধিনিষেধ মেনেই জিহাদ করতে হবে *(দ্র. ফাওযান, আল-জিহাদ: যাওয়াবিতুহূ ওয়া আহকামুহূ, পৃ. ১৫-১৮)*। **(৫)** নফল জিহাদ হলে অবশ্যই পিতা-মাতার অনুমতি নিতে হবে *(বুখারী, হা/৩০০৪, মুসলিম, হা/২৪৪৯, আহমাদ, হা/১১৭২১)*। **(৬)** জিহাদ পরিত্যাগের ক্ষতির চেয়ে জিহাদ করার ক্ষতি অধিক হওয়া যাবে না *(দ্র. আব্দুস সালাম সুহায়মী, আল-জিহাদ ফিল ইসলাম, পৃ. ৬৬)*। তবে কারো উপর জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য অবশ্যই তার মধ্যে এই শর্তগুলো থাকতে হবে: **(ক)** তাকে মুসলিম হতে হবে। **(খ)** বিবেক-বুদ্ধি থাকতে হবে। **(গ)** প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। **(ঘ)** স্বাধীন হতে হবে। **(ঙ)** পুরুষ হতে হবে। **(চ)** শারীরিক সক্ষমতা থাকতে হবে এবং **(ছ)** জিহাদে খরচ করার মতো অর্থ থাকতে হবে *(দ্র. ঐ)*।

বুঝা গেলো, জিহাদ কস্মিনকালেও কারো প্রতি যুলম নয়। বরং ইসলামে জিহাদ অত্যন্ত পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি বিষয়, যার সাথে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। ইসলামে জিহাদের নির্দেশনা না মেনে কারো জান-মাল-ইযযতের উপর আক্রমণ করা কখনই সমর্থিত নয়। বরং তখন তা জিহাদ না হয়ে উল্টো উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদে পরিণত হয়। আর এর কারণে ইসলাম ও মুসলিমরা কলঙ্কিত হয় এবং পিছিয়ে যায়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় এবং অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জিহাদকে চরমপন্থা, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সাথে গলিয়ে ফেলা নেহায়েত অন্যায়; যে পথে হেঁটে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা করে যাচ্ছে সমগ্র কাফের-দুনিয়া। আর এপথে মদদ যোগাচ্ছে একশ্রেণির মুসলিম তরুণ-যুবক, যারা বুঝে না বুঝে কুরআন-হাদীছের কিছু বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে অতি আবেগী ও অতি উৎসাহী হচ্ছে আর বিভিন্ন মুসলিম সরকার, জনগণ ও সালাফী আলেমগণের ব্যাপারে নানা ফতওয়া জারি করছে, তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে এবং হরেক রকম ট্যাগ লাগাচ্ছে। বরং আরো আগ বাড়িয়ে তারা চোরাগুপ্তা ও অতর্কিত হামলা চালিয়ে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বময়।

মনে রাখতে হবে, যারা জিহাদ সংক্রান্ত উপর্যুক্ত নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না, তারা মূলত খারেজী বা চরমপন্থী। তারা মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের বা ত্বাগূত রাষ্ট্র মনে করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্যদান ও অস্ত্র ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে থাকে। কারণ তাদের আক্বীদা মতে, কাবীরা গুনাহগার কাফের। তাদের এ ধরনের আক্বীদা চরম ভ্রান্ত এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে শরীআত-নিষিদ্ধ। ইসলামের সঠিক আক্বীদা হচ্ছে, কাবীরা গুনাহগার ফাসেক্ব মুমিন হিসেবে গণ্য হয়। ফলে প্রকাশ্য কুফরীতে না জড়ানো পর্যন্ত মুসলিম শাসক মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে এবং এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের সকল বৈধ নিয়ম-ক্বানূন ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা প্রত্যেক মুমিনের আবশ্যক হবে। ভুল দেখতে পেলে সাধ্য অনুযায়ী সংশোধনের জন্য শারঈ পদ্ধতিতে নছীহত করতে হবে ও আন্তরিকভাবে দু'আ করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund
Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Account No: 20501130204367417

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No: 20501130204367316

দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund
Account No: 20501130204367802

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund
Account No: 20501130204367903

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund
Account No: 20501130204367600

বিকাশ এজেন্ট : ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ | বিকাশ পার্সোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ ; ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ | রকেট পার্সোনাল : ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮-৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

Monthly Al-Itisam الاعتصام 5th Year, 9 th Part, July 2021, Price : 25.00

নিবরাস প্রকাশনী কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বইসমূহ

আদর্শ পরিবার

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৫৬ | মূল্য : ১৫০ টাকা

মরণ একদিন আসবেই

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৮৮ | মূল্য : ১৫০ টাকা

কে বড় লাভবান

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৬০ | মূল্য : ১৫০ টাকা

রিযিক্ব

লেখক : আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

পৃষ্ঠা : ৯৬ | মূল্য : ৭০ টাকা

তাফসির কি মিথ্যা হতে পারে?

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ১৯৬ | মূল্য : ১০০ টাকা

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৮০ | মূল্য : ১৫০ টাকা

যোগাযোগ : নিবরাস প্রকাশনী

রাজশাহী শাখা : এমাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬
বাংলাবাজার শাখা : গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৪০৭-০২১৮৫০

الاعتصام Al-Itisam TV

কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার লক্ষ্যে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ইতিছাম টিভি। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ অন্যান্য আলোচকদের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নিয়মিত দারস পেতে আল-ইতিছাম টিভি সাবস্ক্রাইব করুন!

www.facebook.com/alitisamtv www.youtube.com/c/alitisamtv